আল মুজাহিদী

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা

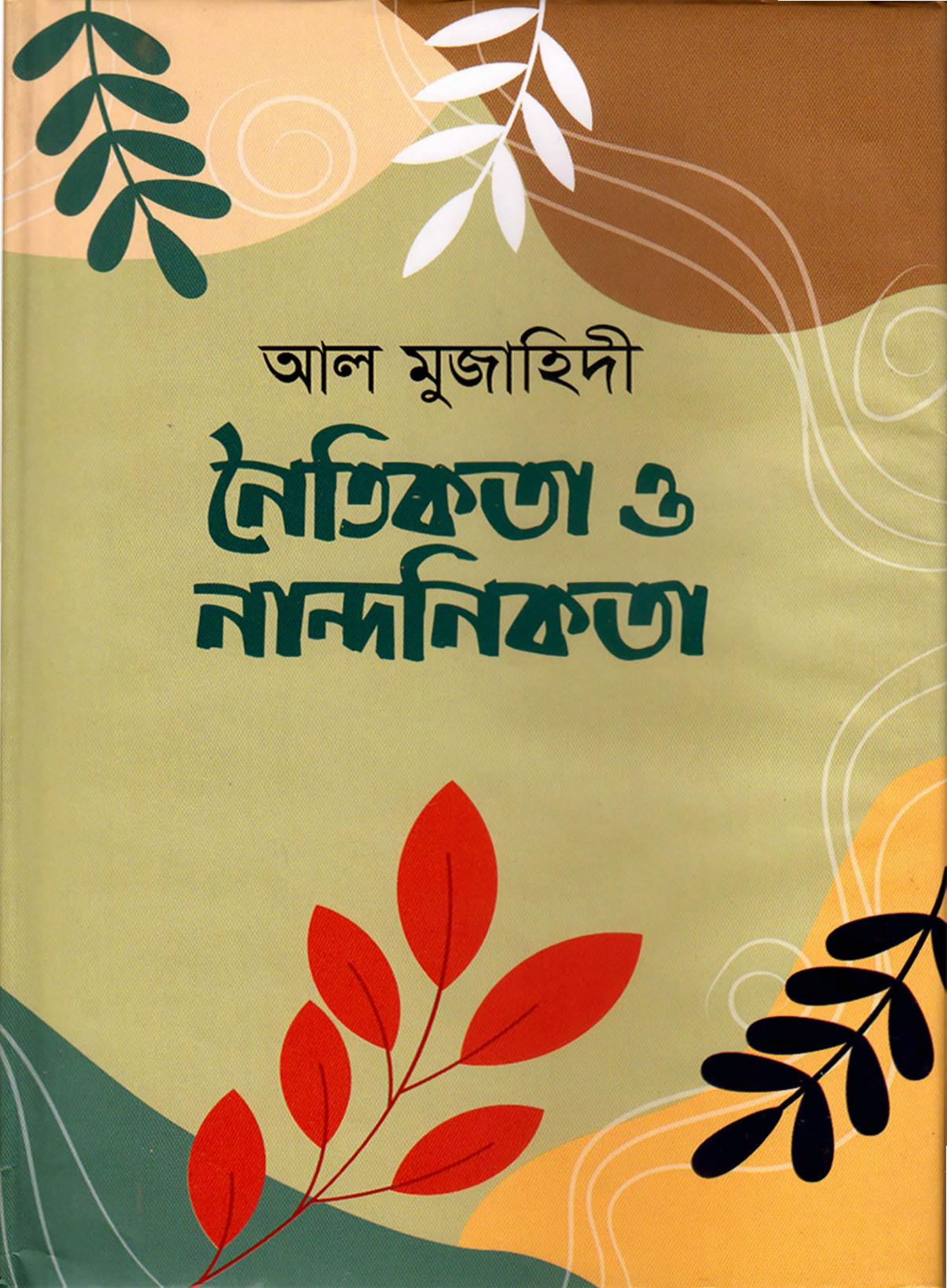

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা

আল মুজাহিদী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা

আল মুজাহিদী

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন : ০৩১-৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

E-mail : booksocietyctg@yahoo.com

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ০২-২২৩৩৮৯২০১, ০২-২২৩৩৯০৮৪৪,

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১

E-mail : booksocietyltd@yahoo.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রচ্ছদ : ফরিদী নুমান

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ০২-২২৩৩৮৯২০১, ০২-২২৩৩৯০৮৪৪

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-২২৩৩৬৩৮৬৩

৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০২-২২৩৩৫৪৫৯০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com, www.booksocietyltd.com

Facebook.com/booksocietyltd.

NAITIKATA O NANDONIKATA Written by: Al Mujaheedi, Published by: S. M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk-250.00 Only US $ 8.00 ISBN. 978-984-8000-41-0

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

. . . . . .

সৈয়দ নজরুল ইসলাম/প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম/শামসুল হক
অলি আহাদ/কাজী গোলাম মাহবুব/আবদুল মতিন
গাজীউল হক/অধ্যাপক আবদুল গফুর

রাষ্টভাষা আন্দোলনের আট অগ্নিপুরুষের উদ্দেশে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

স্বদেশ, দেশপ্রেম, মানবতা, মাটি ও মানুষের কবি আল মুজাহিদী। শিল্প-সাহিত্যের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করেছেন সমান দক্ষতায়। কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তিন দশকেরও অধিক-কাল তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক এবং পরে সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদকে' ভূষিত হয়েছেন।

আল মুজাহিদী সমাজ বিকাশে সামনের কাতারের সৈনিক। কাল ও সমাজ সচেতন বিশ্ববীক্ষণের কবি। স্বভূমি, স্বদেশ এই সমতটের লোকায়িত ঐতিহ্য বন্দিশে আত্মমগ্ন তিনি। ৬০-এর দশকে ছিলেন ছাত্র রাজনীতির অন্যতম পুরোধা। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রাজবন্দি হয়েছেন। সশস্ত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করেছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা আল মুজাহিদীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাজ্ঞ তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনা, স্বাধীনতা ও মানবিকতা আল মুজাহিদীর কবিতায় নানাভাবে উচ্চারিত, উচ্চকিত হয়েছে। প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল এই কবির চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা স্বতন্ত্র ধারায় বহমান। শতাধিক গ্রন্থ রচয়িতা কবি আল মুজাহিদী বিস্ময়কর জাগরণের, আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের জন্য তিনি সব শ্রেণি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়েছেন।

সমাজমনস্ক ও স্বদেশ-আত্মার মানুষ আল মুজাহিদী লেখক হিসেবে ডালপালা ছড়িয়েছেন উভয় বাংলায়। অসম্ভব শক্তিশালী তাঁর কল্পনার জগৎ। পৃথিবীর শুভ্রতর, অধুনাতন বার্তা বয়ে বেড়ান তিনি। মানব সম্প্রীতির সমুজ্জ্বল সম্ভাষে স্ফূর্ত।

www.nagorikpathagar.org

নির্মাণ শৈলীর দিক থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন ধারায় এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন। দেশের বাইরেও আল মুজাহিদীর জনপ্রিয়তা প্রগাঢ়ভাবে লক্ষ করা যায়।

'নৈতিকতা ও নান্দনিকতা' আল মুজাহিদীর প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯টি প্রবন্ধ নিয়ে লেখক এই গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। এ গ্রন্থে আমাদের জীবনের উদ্যানের 'মানব মুকুল' সঞ্চায়ন করার এক ইতিবাচক প্রয়াস লক্ষণীয়। এখানে লেখকের শিল্পবোধ ও রুচির সমন্বয় সাধনে 'শৈল্পিক নিরিখটি' বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। এ প্রয়াসে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর পক্ষ থেকে লেখককে সাধুবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। বইটি প্রকাশে পাঠক ও লেখকমহল অনুপ্রাণিত ও চেতনায় প্রদীপ্ত হবে। এমনটাই প্রত্যাশা করি।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচিক্রম

.....

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা। ৯
মধুসূদন দত্তের 'কবি', 'কবিতা' ও 'কল্পনা'। ২৩
নোবেল লরিয়েট সোলঝেনিৎসিন। ২৮
পাজের পরাব্যাজস্তুতি। ৩৬
অধ্যক্ষ আজরফের জীবনদর্শন। ৪৪
নূরুল মোমেনের নেমেসিস। ৫২
হাসান হাফিজুর রহমান : স্বভূমি স্বদেশে। ৫৮
নীড় তার নীড় নয় অনিত্যের কোলাহল। ৬৫
কবির বিভাব কবির বিভাস। ৭৫
মরতা নিয়েই মরতাকে জয় করে নেয়া। ৮৩
সুহৃদয় সহৃদয় ইলিয়াস। ৮৭
ডা: জোহরা কাজীর সেবাদর্শন। ৯৮
শ্রম বিশ্রাম আনন্দ। ১০৩
সুন্দরের দ্রষ্টা। ১০৯
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ১১৪
গ্যুন্টার গ্র্যাস : অস্তিত্বের রাজপুরুষ। ১১৯
আলেক উদ্যানে অনিন্দ্যকান্তি মুকুল। ১৩০
বই ও বিবেকিতা। ১৩৫
বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা। ১৩৮

www.nagorikpathagar.org

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা

পৃথিবীর মানববসতি ও লোকপদে মানবিক অনিশ্চয়তা ধেয়ে আসছে। মানুষের ভেতর ফুঁড়ে মানবীয় হাহাকার আছড়ে পড়ছে। আর সেখানে জমাট বাঁধছে মানুষের শূন্যমার্গীয় অন্তঃসারশূন্যতা। প্রচণ্ড স্তুতিব্যাজ ব্যক্ত করে জীবনবাদী মহান কবি T. S Elliot তার The Hollowmen কবিতায় উচ্চারণ করেছেন-

"We are the hollow men.
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw, alas!
Our dried voices, when
We whisper together.
Are quiet and meaningless
As wind. in dry grass
Or rat's feet over broken grass
In our dry cellar".

মানুষ এ অন্তঃসারশূন্যতার আঁধারে বেঁচে থাকতে পারে না। সে এ অন্তঃসারশূন্যতার আবর্তে আবর্তিত হতে পারে না ক্রমাগত। এ থেকে মানুষের নিস্তার নেই কি? উদ্ধার থাকবে না আমাদের? ভেতরকার এ অন্তঃসারশূন্যতার অতল তামস তো কাটিয়ে উঠতেই হবে। অন্তর্দেশের অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের সবচেয়ে বড় মানবিক সঙ্কট। এটা যেন অসহায় আত্মার অসার নিরলঙ্কার কলহ। এ স্থূলতা এ দৈন্য আমাদের মানবিক বৈপরীত্যে অবস্থান নেয়। এ স্থৈর্য মনোজগতে তৈরি করে অচলপত্রের কৃষ্ণ অধ্যায়। আর এ থেকে তার ভেতরে ভেতরে রচনা করে যেতে থাকে শম্বুকের খোলসের আধারে কৃত্রিম বন্দিদশা। এই ক্ষুদ্রতা, স্থানুতা, সঙ্কীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা মানুষের স্বভাবের শ্বেতপত্র গ্রাস করতে থাকে। এ আগ্রাসনটাকে পরে প্রতিরোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। হিংসায় শ্রেণিবৈরিতার উদগম হয়। প্রবল শ্রেণিত্বরণ ঘটে যেতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে মানুষের চেতনার মর্মমূলে। এ অসম, রুগ্ন, জরাক্লিষ্ট, অবিকশিত চিন্তা-স্রোত তাকে স্থানু ও স্থবির করে ফেলে। রক্তিম করে তোলে হৃদয়ের কোমল কুসুমটাকে। মানুষের হিংসার পরাক্রান্ত শক্তি তার জীবনের কূল-উপকূল ছাপিয়ে বয়ে যেতে পারে। আর এ হিংসা লুকানো থাকে তারই গোপন আস্তিনের নিচে ভেতরের সংগুপ্ত কিংখাবে। ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা হয়তো ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু বড়'র বড়ত্বের ক্ষুদ্রতা বড় ভয়ঙ্কর। মানুষ তার অন্তর্গত এ ক্ষুদ্রতাকে জয় করতে পারে তার চেতনার প্রসার ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে, ভেতরের উৎকর্ষ কিংবা সৌকর্যের মধ্য দিয়ে। সেটা হবে মনুষ্যত্বের বিকাশের ধারায়। আমরা কি পারি না আমাদের এ চেতনার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে? মানসিক অসহিষ্ণুতা আমাদের চেতনার সমগ্রতায় দূর করে দেয়া সম্ভব। যদি আমাদের ভেতরে জেগে ওঠে সামূহিক ঐকান্তিকতা। মানবচিত্ত যখন এ রকম আধ্যাত্মিক শুচিতার আরক রসে সিক্ত হয় তখনই কেবল সর্বতো শুভোদয়প্রাণ মূর্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র মানব সমাজও এক মহান মানব পরিবারে সম্মিলিত হয়। এ ধারণাটুকু যদি শুধুমাত্র একটি আইডিয়া অথবা ইউটোপিয়া কিংবা নিছক আপ্তবাক্যে পরিণত হয় সেখানে কোনোই মুক্তি ঘটবে না সভ্যতার। চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনের শুদ্ধতা, সমৃদ্ধ চেতনার সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি আগামীর শুভতাই আলিঙ্গন করবে আমাদের তখন। নতুন দরজা খুলে দেবে ভবিষ্যত্বের জ্যোতির্ময় তোরণে পৌঁছে যাবার। এটা কল্পকাহিনী কিংবা রূপকথার মতো কোনো কথা নয়, এটা বিষয়াতিগ ও বাস্তবানুগ এবং একটি প্রায়োগিক প্রয়াসধারা। দেয়াল ভেঙে, পাহাড় কেটে কেটে পাহাড় ডিঙানোর কথা। মধুচন্দিমা কিংবা জ্যোৎস্নার চাঁদ লুফে নেয়ার মতো হয়তো তেমন কিছু নয়। জীবনের নিরাভরণ উন্মোচন হয়তো এটা। বিষাক্ত, ক্লদ ও কর্দমের ক্লেদজ কাপালিককে কুঠার চালিয়ে সংহার করার মতো কিছু। বাস্তবের মাটিতে শক্তপায়ে দাঁড়ানোর মতো ব্যাপার। দরজা খোলা পাওয়া যায় না। কখনও দরজায় সাটানো খিল খুলে নিয়েই সদর মহলে প্রবেশ করতে হয়।

উপলখণ্ডের মতো আমরা তো ভেসে যেতে পারি না। কালের ভেলায় ভেসে ভেসে আমরা কোথায় গিয়ে থামব। মানবজমিন তো কোথাও আছে। কোথাও কেন? সর্বত্রই আছে। এক স্থানে তো মানবকুলকে অবস্থান নিতে হয়। দেশ কাল গণ্ডির সীমা অতিক্রম করে আমাদের কোথাও অবশ্যই অবস্থান নিতে হবে। আবার এক অবস্থায় থেকে অন্য অবস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে এটাই বুঝি মানব প্রবাহ। এই প্রবাহ মানবতার চাঞ্চল্য ও প্রসারণে আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যুৎ বয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে উপচার ও অস্তিত্ব এক কথায় তার মনুষ্যত্ব যোজনা করে মানবজাতির জীবনযাত্রার ও জীবন চর্যার প্রবহমানতাটুকু সচল রাখতে হবে।

আমরা তো জানি, মানুষের মননের মহার্ঘতা-চেতনার স্ফূরণ ও জাগরণ এবং সৃষ্টিশীলতার ফল্গুধারা যদি বহমান থাকে সতত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাহলেই কেবল জগৎ সংসার সরব ও সচল থাকে। মনন ও সৃজন মানবস্বভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই বড়। সমাজ সংগঠনের প্রধান উপাদান। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ছাড়া সমৃদ্ধমান সমাজ গড়ে ওঠে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথটি যতটা সুগম করে তোলা যাবে সমাজের বিন্যাস ও সমন্বয় ঘটতে থাকবে তত বেশি মাত্রায়। ব্যক্তির চোখের সুন্দর স্বপ্নটি সমাজের চোখের কোটরে এক স্বচ্ছ আলোর পারা বসিয়ে দেয়। জঁ-জাক রুশো JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) মানবজাতির অসমতার উৎস এবং ভিত্তি নিয়ে ভেবেছেন গভীর তন্ময় হয়ে । তিনি বলেছেন:

> *"কারণ মানবতাকে জানার চেষ্টা দিয়ে যদি শুরু না করি তবে মানবতার সমতার উৎসের সন্ধান করব কি করে? কি করে জানবে সে, তার আদি দেহটিতে সময় এবং স্থানের পরিবর্তনের পরম্পরায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে? গ্লকাসের মূর্তিটি যেমন সময়ের টানাপড়েন এবং ঝড়ঝঞ্ঝায় এমন বিকৃত হয়েছে যে তাকে দেবতা নয়, বন্য পশুর মতো মনে হয়-তেমনি মানুষের আত্মাও পরিবর্তিত হয়েছে সহস্র কারণের নিরন্তর আবর্তনে, সহস্র সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে, দেহের নানা পরিবর্তনে, কামনা-বাসনার তীব্র ভাঙাগড়ায়, এককথায় তার এত পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে আর আদিমরূপে চেনাই যায় না। স্রষ্টা মানুষকে যে ঐশ্বরিক ও ভাবগম্ভীর সরলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে অভ্রান্ত ও অনড় নীতিমালা দিয়ে তাকে গতিময় করেছেন- তার পরিবর্তে আমরা মানুষের মাঝে দেখতে পাই কামনার ভয়াবহ বৈপরীত্য- যাকে সে বিবেক বলে ভুল করে দেখতে পায় উপলব্ধির বিভ্রান্তিকে।"*

মানবজাতির অগ্রগতির দিকে রুশো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছেন যে, মানবজাতির প্রতিটি পরিবর্তন তাকে তার আদিম অবস্থা থেকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। তিনি এ ব্যাপারে সম্যক চিন্তাধারা তুলে ধরে বলেছেন যে, আমরা যতই নতুন কিছু আবিষ্কার করি ততই আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ আবিষ্কার করা থেকে

www.nagorikpathagar.org

নিজেদের বঞ্চিত করি। সুতরাং এক অর্থে মানুষ সম্পর্কে আমাদের অর্জনই আবিষ্কার করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি। এক অর্থে মানুষ সম্পর্কে আমাদের অর্জনই মানবজাতির জ্ঞানকে আমাদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যায়।

দেহের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিবর্তন থেকে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতায় সূচিত হয়েছে সমতার সাথে সাথে অসমতাও ঢের। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রচিত হলো নানা পার্থক্য, বিভিন্নতা, বৈষম্য অর্থাৎ অসমতা। 'সদবৃত্তি' ও 'অসদবৃত্তি' এসে গেল মানুষের আচরণের ভেতরে ও বাইরে। রুশোর মতে মানবজাতির অসমতার প্রথম উৎস এটাই।

মানুষের সমাজে আজ নানাবিধ অসমতা জেঁকে বসেছে। আর এটা ঘটে যাচ্ছে সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠা অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, নব্য ধর্মনিরপেক্ষ মৌলবাদী অসহিষ্ণুতা। এখানে এসে যুক্ত হয়েছে অন্ধ, উদ্ধত, উগ্র রাষ্ট্রশক্তির দাপটও। এতে করে দেশে-বিদেশেও, পৃথিবীর সকল সমাজে হিংসার বিকৃত ও বিকট, রূপ প্রকট ও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। এই তামসিক পরিস্থিতি থেকে দেশ ও জাতি, পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী- সভ্যতা ও প্রগতিকে কি করে মুক্ত করা যায় তার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আমাদের ছোট-বড়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, শক্তিমান ও দূর্বল সবাইকে ভাবতে হবে।

পৃথিবীর প্রতিটি দরজা ঘুরে ঘুরে কে দেখে আসবে মানুষের ভেতরের দৈন্য, হৃদয়ের অন্তঃসারশূন্যতা? বিশ্বের মানুষের দরবারে দাঁড়িয়ে কে বলবে, আসুন, আমরা আমাদের ভেতরের অসম অশুভতা দূরীভূত করি। বড়দের, বিত্তবানদের, বিক্রমশালীদের পরাক্রমভাব দূর না হলে সমাজের নিয়ন্ত্রণভার কখনও সাবলিল, সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার নয়। হিংসা, প্রতিহিংসা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা যখন দূর হবে তখনই মানবচিত্তের জয় হবে। জীবন সৌকর্যমণ্ডিত হবে, কর্মযজ্ঞের ঐকান্তিক আতিশয্যে।

এ যুগেও, একালেও বহু মতের সমন্বয় ও সহাবস্থান হতে পারে। উপরতলার উগ্র মত চাপিয়ে দিয়ে অপরকে পর্যুদস্ত করার মতো হীনকাজ আর কি ই বা হতে পারে। কেউ যদি অন্য কারুর মতের সঙ্গে ঐকমত্য স্থাপন করতে না পারে এতে তার কোনো অপরাধ হয়ে গেল এমন তো নয়। বহুজনের বহুমত, বহুজনের বহুভাষার উচ্চারণ যে সমাজ দু'কান পেতে শ্রবণ করে সেই সমাজই তো স্বাধীন, মুক্ত ও অবাধ। পরমতে সহিষ্ণু না থাকলে আমার মতটি যে কখন অন্যেরা অগ্রাহ্য করে বসবে সে কথা বলাই বাহুল্য। পরমতে সহিষ্ণু হয়ে ওঠার সংস্কৃতি যদি আমরা অর্জন

www.nagorikpathagar.org

করতে ব্যর্থ হই আমাদের সমাজ ও স্বাধীনতার তাৎপর্য, মুক্তি চেতনায় গৌরব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে।

আজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ বাধছে। কাল রাতেই শান্তি ও সংহতি, প্রেম ও ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করেছে যারা, যে পক্ষে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি চাই। উভয় রাষ্ট্রের উন্নতি ও স্থিতিশীলতা চাই। আবার দেখা যায় অতি এই প্রত্যুষেই ভীষণ সংঘর্ষে মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে দুই রাষ্ট্রই। রাষ্ট্রশক্তির প্রীতির কৌতুক ও শান্তির খেলাঘর যে 'জতুগৃহ' -এর মতো একটা কিছু এ কথা বলবারই অপেক্ষা রাখে না। প্রেম প্রীতির সঙ্গে হিংসার কোন মেলবন্ধন কখনও হতে পারে না। সম্প্রীতির নামে সমূহ উৎপীড়ন একুশ শতকের সহস্র প্রত্যুষ নরমেধ যজ্ঞে রঞ্জিত। সন্ত্রাস ও বীভৎস শক্তির দাপট-দম্ভ, আগুনে অঙ্গার অহমিকা যেন পৃথিবীর, জগত-সংসারের আলো বাতাস, বাতায়ন-বাতাবরণ সব ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। 'আণবিক অনিশ্চয়তায়' মানববসতি ও প্রকৃতি-পরিবেশ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে সভ্যতার নামে সভ্যতার কালো অসূরের পাল। প্রগতি ও শান্তির নান্দিপাঠ করে উৎপাটিত করতে চাইছে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের এই প্রগতি বিধ্বংসকারী উল্টোপায়ে হাঁটা অন্ধকারের দানবেরা। আমরা কি করে প্রগতির পথে যাত্রা করব? আমরা কি করে সভ্যতার সন্ধানে পা বাড়াব। তবু এই বারবেলায় তামসিকতার অতল আঁধার অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদেরই। আমাদেরই প্রার্থনা করতে হবে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও শুভ চেতনার উন্মেষের জন্য। শত বিষাদের মধ্যেও আমাদের প্রার্থনা করতে হবে অপরিমেয় আনন্দের জন্য। হিংসার আবর্তে আর আমাদের কত ঘুরপাক খাওয়া? প্রেম ও হিংসা কি একই পাত্রে রাখা চলে? কস্মিনকালেও নয়। প্রেম ও শান্তির ললিত বাণী আর হিংসার বাড়াবাড়ি একসাথে বহমান নয়। মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে তার মনুষ্যত্ব। আর এ মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে যখন ব্যক্তিত্ব যোগ হয়, তখনই মানুষ অর্জন করতে থাকে জীবনের মাত্রাবৃত্ত ও নতুন মর্মস্রোতে। শ্রেয়তা ও শুভতায় জারিত হতে থাকে জীবন ও জগৎ। মানুষের ভেতরে যে বিপুলতা সংগুপ্ত থাকে সেটা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে একটি যৌগিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে।

আমরা এখন যেভাবে লোক দেখানো সত্যের আহ্বান করি যে আহ্বানে আমাদের গোপন কোটরে মিথ্যার মাত্রাই থাকে বেশি। সেজন্য এ সত্য আহ্বানে শ্রেয়তর কোনো কিছু প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় অন্তর্কলহের ইঙ্গিত এবং অদম্য অহমিকা। এই পরাবৃত অহমিকা সত্য ও মিথ্যার পরস্পর বিরোধিতাকে উসকে দেয়। অহমিকা

www.nagorikpathagar.org

কখনো বিবেকের কিংবা সত্যের আহ্বান শোনে না। সত্য ও মিথ্যার এ অমিল চিরকালের। ব্যক্তির মনন ও সৃজনবোধ যখন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ ঘটায় ঠিক তখনই সমাজও শ্রেয়তর মানবিক জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আবার যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হিংসা ও হিংসাশ্রয়িতা অদম্য-অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করে তখন সমাজের মনন ছিন্নভিন্ন করে তোলে। ইতিবাচকভাবে ব্যক্তির মননের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে।

যুগে যুগে কালে কালে বহু মত বহু পথের রূপকল্প সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগেও এ কালেও আরও বহু মত এসে মানুষের চিন্তা ও চেতনার দিগন্তকেই মেলে দিয়েছে। আরও মেলে দেবে দূরগামী করে। এ থেকে মতের পথের বৈচিত্র্যের অবধিরও যেন কোটা শেষ নেই। মানুষ নিজেই যখন তার নিজের আত্মবেদী অস্তিত্বের মুখোমুখি হয় আত্মসত্তার হাজারদুয়ারি রহস্যের আলোকচ্ছটায় সঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক অজ্ঞাত, অনন্যপূর্ব, জগতের অন্তহীন আলো এসে ঠিকরে পড়ে তার চোখের সামনে। জীবন-উৎসের আলোকলতা উদ্ভাসিত হতে থাকে। এটা তার সত্তার আলোকলতা চারিয়ে ওঠে ধীরে ধীরে বাতায়ন পথে। এ যেন তার নিজেরই সময়ের ওপর লতানো অর্কিড কখনও অলৌকিক, কখনও পার্থিব। অস্তি-চেতনা থেকে অস্তিত্ব জেগে ওঠে। আবার অস্তিত্বের আধার থেকে উৎসারিত হয় আনন্দবোধ। আনন্দচেতনা থেকে উদগ্‌ম হয় সুন্দরের ও কল্যাণের। সুন্দরের শুভচেতনা থেকে সঞ্জীবিত হয় প্রেমের অমৃতধারা। প্রেমের আনন্দধারা পান করে মানব জীবন সমৃদ্ধ হয়। পরিব্যাপ্ত হয় তার জীবনের পরিসর। হিংসার বহ্নিতে জ্বলেপুড়ে নিজেকে অস্থির করে তোলা যায় শুধু। অস্থিরতা আমার ভেতরেও আছে। আরও অনেকের ভেতরেও জন্ম নিতে পারে। কিন্তু সংযমের স্বচ্ছন্দ আবরণে সব অস্থিরতা অবদমিত হয়ে যেতে পারে। মানবদেহ ও মানবজীবন এ সংযম স্বভাব অর্জন করতে সক্ষম হলে নতুন নতুন আভরণে অলঙ্কৃত হতে পারে।

প্রেম ও হিংসার নাটকের একই নাট্যমঞ্চে মহড়া চলছে। প্রেম ও শান্তির বুলি মুখে উচ্চারণ করে নাট্যমঞ্চে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ছায়া ফেলা হচ্ছে। যুদ্ধংদেহী উগ্র বাসনা দেহের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকে। আজ ইরাক আর ইরাকবাসীর ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ব্যবিলনীয় সভ্যতার নিশানা মুছে ফেলার দানবীয় যজ্ঞে মেতেছে বুশ প্রশাসন। 'গিলগামেশ' এই পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য। (Epic) পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে আমেরিকা। পৃথিবীর প্রাচীনতম Holy scripture পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত করেছে। ইতিহাস এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিশোধ নেবে একদিন না একদিন। এটা অবধারিত এবং ইতিহাসের অনিবার্য শিক্ষা এটাই।

www.nagorikpathagar.org

হিংসা মনন ও সৃজনের শক্তিকে সংহার করে চলে। হিংসার ভেতর মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটে। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ববোধ মানুষের হিংসার কপাট ভেঙে ফেলে দিয়ে মনন রাজ্যের সকল সৃজনশীল দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। যেখানে মননের সংযোগ আছে সেখানে জীবনের কোমল কুঁড়ি পাপড়ি দল মেলে দিয়ে পল্লবিত হতে থাকে। হিংসার উন্মুক্ত প্রকাশ ঘটতে থাকে ভেতরের কোনো উষর মরু প্রান্তর থেকে সেই জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বে নিজেকে জর্জরিত করে তুলতে পারলে, বোধহয় আমরা মননের নতুন মরুদ্যান আবিষ্কার করতে পারি। ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে আমরা যদি আজ আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের মাত্রা সতর্কভাবে নিক্তির পাল্লায় তুলে নিরিখ করতে পারি তাহলে হিংসার বিপরীতে প্রেমের আলিঙ্গনে সকলে আবদ্ধ হতে পারি। মানুষ যখন নীতি ও নৈতিকতাচ্যুত হয়ে পড়ে তখন থেকেই তার ভেতরের শিরা-উপশিরায় অবক্ষয় ভাঙ্গন প্রিতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সৃষ্টি– যাকে মানবিক বিষয় আমরা ফাঁপা মানুষের ভেতর মনুষ্যত্ব কাজ করে না।

"Shape without form shade without column
Paralysed force, gesture without motion:
Those who have crossed
with direct eyes, to death's other kingdom
Remember us- if at all- not as lost
Violent souls, but only
As the hollowmen
The stuffer me."

মৃত্যুর বিবরের দিকে যাত্রা করে সে। সরব আত্মাগুলো কি রকম স্থির স্থবির হয়ে যেতে থাকে। মানুষের ভেতরের ভগ্নদশা মানুষকে ক্রমাগত ভগ্নস্তূপে নিক্ষেপ করে। একটি পোড়াবাড়ির মতো পড়ে থাকে তার দেহরূপ কাঠামো।

"Eyes I do not meet in dreams
In death's dream kingdom
Those do not appear
There, the eyes are."

www.nagorikpathagar.org

চক্ষুকোটর স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে। স্বপ্নের চিহ্নগুলো বিলীন হতে থাকে। এ যেন আরেক কল্পান্ত।

"Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.
Let me become nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer.....
Not that final meeting
In the twilight kingdom."

মানুষ যখন ধীরে ধীরে ফাঁপা হতে হতে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে ভাঙা স্তম্ভের ওপর যেন সূর্যালোকও পৌঁছাতে চায় না। নিষ্কম্প পাথরের মতো পড়ে থাকে সবকিছু। এ যেন এক মৃতের মৃতভূমি। নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ সবই।

"This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they recive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.

www.nagorikpathagar.org

Is it like this
In death's other kingdom
Walking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone."

কিন্তু মানুষ তো কোনো মৃত নক্ষত্রের ছায়াহ্রদে বসবাস করতে পারে না। এ ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য উপত্যকায়, ভগ্ন চোয়াল নিয়ে এখানে বসবাসই বা করবে কি করে?

"The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms
In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men. "

এই মৃত্যু উপত্যকায় মানুষেরা কোনো কথাও বলতে পারে না। অস্ফুট, অস্পষ্ট যেন তার অস্তিত্বের সবকিছুই।

www.nagorikpathagar.org

"Here we go round the prickly pear

Prickly pear prickly pear

Here we go round the prickly pear

At five o'clock in the morning.

Between the idea".

আমাদের কোপন স্বভাবের নিকুচি করে আমাদের তো প্রত্যুষের সদ্য ফোটা আলোয় বেরিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া গত্যন্তরই বা কি আছে? কল্পনা ও বাস্তবিকতার দোলাচলেই স্পন্দিত হতে হবে আমাদের। টি. এস. এলিয়ট শ্লেষাত্মক ভাষায় সেই বিবরণ দিয়েছেন এখানে।

"And the reality

Between the motion

And the act

Falls the Shadow

For Thine is the kingdom.

Between the conception

And the creation

Between the emotion

And the response

Falls the Shadow

Life is very long."

জীবনের যাত্রা যদিও সুদীর্ঘ-সুদূরের পথে। তবু ধারণা, অনুভূতি ও গতিবেগ থেমে যেতে চায়। তবু চলিষ্ণু থাকতে হবে মানুষকে এ সংসার যাত্রায়। সাড়া দিতে হবে অস্তিত্বের সরবতায়।

"Between the desire

And the spasm

www.nagorikpathagar.org

Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is the
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper."

একদিন মানুষও তার মনুষত্বের অণু-পরমাণু কণা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এভাবে সে জগৎ-সংসারের আলো বাতাস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাষা ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলে। মহান স্রষ্টার রাজ্যে তার শুধু দীর্ঘশ্বাস আর্তস্বর শোনা যায়। নীরব নিঃশ্বাস ছায়াবাতি ঘটে পৃথিবীর আলো দেখা হয় না। সমীরণে সিক্ত হওয়া যায় না। বাসনা ও রক্তমাংসের আক্ষেপ ছড়িয়ে পড়ে। তার শক্তি ও অস্তিত্বের মধ্যে নীরবতা নিবিড় হতে থাকে। বংশগোষ্ঠী সত্তা ও সৌন্দর্যের মধ্যে মরাকটালের ছায়া পড়ে। আর এভাবেই বিশ্ব-বসুন্ধরা ক্রমাগত ধ্বংস ও পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। সব দুমদড়াম শব্দ ধরিত্রীর ক্রন্দন, থেমে যায়।

নীতি ও নৈতিকতা থেকে আমরা যখন সরে পড়তে থাকি– ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। আর যে সমাজব্যবস্থায় জবাবদিহিতার বালাই নেই সেখানে নীতি ও নৈতিকতার কেউ তোয়াক্কাও করে না। অস্থিরতা আছে অনেকের মধ্যে, কিন্তু অস্থিরতা আর জিজ্ঞাসা এক বস্তু নয়। জিজ্ঞাসার জন্ম হয় দ্বন্দ্বের বোধ আর মননের সংযোগ থেকে। সবাই প্রতিবাদী হন না, কেউ কেউ প্রতিবাদী। সমাজ জীবনে এবং আদর্শের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী কিছু

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ এসে হাজির হয়। সত্যের অথবা বিবেকের আহ্বান তার সম্প্রদায় অথবা সংখ্যাধিক্যের দাবির মধ্যে দেখা দেয়। ব্যক্তির বহুমুখী বাসনা ও প্রবৃত্তির ভেতর দ্বন্দ্ব তো লেগেই আছে। এসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ ব্যক্তিকে অস্থির করে তোলে; যুক্তি ও চিন্তনের স্পর্শে এরা জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে।

ভেতরের অস্থিরতা অনাবস্থা জীবনের পরতে পরতে দ্বন্দ্ব-দ্বিধার সৃষ্টি করে। আর ঐ উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো ব্যক্তিজীবনের ঘেরাটোপ পেরিয়ে সমাজের ওপর আছড়ে পড়ে। অনিয়ন্ত্রিত অস্থিরতা অব্যবস্থিত চিত্তের জন্ম দেয়। মানুষের অস্থির, অনিয়ম চিত্ত তার চেতনসত্তার স্বাভাবিক গতিধারায় বিঘ্ন ঘটায়। এবং জন্ম দেয় একধরনের অহংসর্ব স্বভাব। প্রকৃতিস্থতার পরিবর্তে দোলাচলচিত্ততার সৃষ্টি করে ব্যক্তিজীবনে, এরপর অস্পন্দভাবের জন্ম দেয় সমাজ জীবনেও। ব্যক্তির অস্থিরতা যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, ব্যক্তিগত আচরণে আচড় কাটে সমাজদেহে। অসহনশীল হয়ে পড়ে সমাজের সকলের কাছে ব্যক্তির ঐ বাঁধভাঙা অস্থিরতা। জনচেতনার স্তরে ও উপরোক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মানবিক অনবস্থা প্রহার করতে থাকে। ব্যক্তি নিজের ভেতর নির্জন এককবোধের সত্তা জাগ্রত করে। আবার বহুত্ববোধের সত্তাও জাগ্রত করতে পারে। একক ব্যক্তি বোধের চিন্তা থেকে সমাজের বহুত্ব বোধেরও চিন্তা কি করে জাগিয়ে তোলা যায় তার ওপরও নির্ভর করে সমাজ অথবা বৃহত্তর জন-সমাজের বিকাশ ধারা। বাণী যেন সমাজকে জটিল আবর্তে ফেলে না দেয় অন্যভাবে সমাজও যেন ব্যক্তিবোধ বিকাশের জন্যে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি কখনও কোনোভাবে বিচ্ছিন্নবোধ ও বিচ্ছিন্নতার ভাষা নিয়ে বিভক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে সকলের সতর্ক দৃষ্টি দাবি করে। এটাই বুঝি আজকের পৃথিবী। শান্তি, প্রগতি ও সভ্যতার জন্য জরুরিভাবে বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ব-সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে মানব সংস্কৃতির মানবৃদ্ধির উপাদানগুলো দিগন্ত রেখায় আরও বেশি মিলিয়ে দিতে হবে। ব্যক্তিকে আলাদা ভাবা যাবে না সমাজ থেকে কখনই। সমাজ কেন অবজ্ঞা করতে যাবে ব্যক্তিকে? বিশ্ব-পল্লীর বিনীত বাসিন্দা প্রত্যেক ব্যক্তিই। সুতরাং সেই ব্যক্তির নাগরিক অবস্থান, অধিকার ও নিরাপত্তা ব্যস্ত থাকা উচিত বিশ্ব-পল্লীর প্রতিটি নাগরিকের হাতে। একদা এই আবহমান বাংলার আবহমানতায় গড়ে ওঠা পাড়া-পল্লীর সরল হৃদয় মানুষের মতো আমরা কি ধাবিত হতে পারি না জীবনের পথে? সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাশীল, সৌজন্য বাধাটাই বা কোথায়?

www.nagorikpathagar.org

আজ পৃথিবীতে ক্ষমতার ভারসাম্যের ব্যারোমিটারের পারদ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। যে জন্যে বিভিন্ন দেশে বহির্দেশ বা অন্য রাষ্ট্র শক্তির– কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসন কখনও মানসিক আগ্রাসন দানবীয় শক্তির আস্ফালন হিসেবে নেমে পড়ে। অবস্থান ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। শান্তির সুন্দর কুটিরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সভ্যতা ও মানবসংস্কৃতির সম্ভাবনাও বিপন্ন হয়। পারমাণবিক প্রতাপের বাহাদুরি তো আছেই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আক্রমণও অবাধ হয়ে পড়ছে। ধ্বংসলীলা সভ্যতার পাশাপাশি বিরাজ করছে। বিশ্বশান্তির জন্য আমাদের সকল প্রত্যাশা ও প্রার্থনা ঠুনকো ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আমরা কি শান্তির প্রার্থনা সমাধিস্থ করে ফেলব?

জীবনে বেঁচে থাকা অব্দি আমরা তো জীবনকে ভালোবেসে যাব। কিন্তু এই ভালোবাসার সহজাত আরকটুকু নিয়েই তো আমরা কেবল বেঁচে থাকতে পারি না। ভালোবাসা আত্মার অভীপ্সা এবং জীবন তৃষ্ণার মোহনার সঙ্গে মিশে যাবে যখন, তখনই অস্থিরতা অনীহার ক্ষীণতর সৈকত অতিক্রম করে মানুষ গিয়ে দাঁড়াতে পারে মহত্তর মানব-সৈকতে। এটা কিন্তু কোনো অমূলক অবাস্তব ধারণা নয়। মানব জীবনেও জন্ম যেমন সত্য ও শাশ্বত ও মৃত্যুও তেমনি ধ্রুব সত্য। মৃত্যুকে অস্বীকার করার মতো কোনো বিজ্ঞান মানুষের হাতে নেই। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি হিংসা ও ঈর্ষার নয়। প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ পাল্টানো যাবে না। তবে সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তির স্বার্থে প্রবৃত্তির প্ররোচনা হতে হবে।

> "প্রেমের মতোই অন্য এক আদিম প্রবৃত্তি, হিংসা। কেন অধিকতর মৌল? উত্তর সহজ নয়। কেউ হয় তো বলবে আদিম সমাজে প্রেম ছিল না। হিংসা ছিল, অন্তত আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে। অন্য কেউ বলবেন, আত্মপ্রেমই আদ্য প্রেম। আত্মপ্রেমেই আছে সব প্রেমের বীজ। প্রেমের ব্যর্থতা থেকে আসে হিংসা। ব্যর্থতা বোধের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়ে আছে প্রভুত্বকামিতা।"

আপন বাসগৃহে আপন পরিবারে সংসারে প্রভুত্বকামিতা প্রকট হয়ে ধরা পড়ে, যদি আমরা খানিকটা চোখ মেলে তাকাই। জীবনের অভ্যন্তরে প্রেম। সেই প্রেম জীবনের সদর দরজা দিয়েই আসতে থাকে। আমরা হিংসাকে বিসর্জন দিতে চাই প্রেমের ভেতর আত্মস্থ থেকে। হিংসার প্রস্থান হোক। মানুষ প্রেমে অভিষিক্ত হোক, নতুন করে পরিতৃপ্ত হতে থাক প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। ব্যক্তির অন্তঃসারশূন্যতা সমাজে সঙ্কটও সৃষ্টি করে। সমাজের সংহতিও খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক নান্দনিকতা ছাড়া কি কখনও মনুষ্যত্ব কিংবা মানব-সংস্কৃতি বিকাশমান হতে পারে? নীতির শূন্যতা দেখা যায় আমাদের সমাজে, নৈতিকতার সঙ্কট স্ফীত হচ্ছে সমাজে, সম্প্রদায়ে মানবিক নান্দনিকতার চর্চা হবে কেমন করে? সেজন্য বিপ্লব প্রয়োজন। বিবর্তন আবশ্যক। নতুন জীবন চেতনা জরুরি। মানবিক বিবর্তনের জন্য নতুন চিন্তা ও জনচেতনা জাগ্রত করা এখন অমোঘ হয়ে পড়েছে। আমি কখনো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজের চিন্তা করি না। যে মানবিক, হতাশা, নৈরাজ্য, কুয়াশা-কুজ্ঝটিকা, ঝড়ঝঞ্ঝা আমাদের চেতনার অক্ষরেখার ওপর বয়ে যাচ্ছে। আমরাও চলেছি অন্ধকারের পথ ধরে। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার উগ্র অসহিষ্ণুতা আমাদের সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত করছে। হিংসার প্রকটতা ও রাষ্ট্রশক্তির প্রমত্ততা সমাজের মূল্যবোধকেও অস্থির ও অ-স্থিত করে তুলছে।

ব্যক্তির প্রকৃতিতে নিহিত যাকে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা এবং স্বভাবের বিরোধ। সত্তার গভীরে প্রোথিত থাকে অভ্রংলিহ অহং। অহং -এর পীড়ন বড় কঠিন। অহং যতই তীব্র হয়, প্রকট হয়ে ওঠে। জীবনের কুঠুরিতে অন্তঃসারশূন্যতা ও অস্মিতার মাত্রার হেরফের ঘটে তখন থেকেই। নৈতিকতার ভাঙন যখন শুরু হয়, ভেতরে ভেতরে হৃদয় প্রকোষ্ঠের দরোজাও ভেঙে পড়তে থাকে। নৈতিক আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবন সমৃদ্ধ হতে থাকলে সমাজজীবনে নৈতিকতার মেলবন্ধন স্থাপিত সমৃদ্ধ হতে পারে। নীতি, শ্রেয়বোধ ছাড়া জীবন কখনও এগোতে পারে না। বরং পেছনের দিকেই ফিরে যেতে থাকে। ব্যক্তি নীতি, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেসিতা, স্বপ্ন যেমন তাকে নিয়ে যেতে থাকে সামনের দিকে সমাজকেও সমান গতিতে সামনের দিকে ধাবিত করতে নতুন স্পন্দন তোলে।

নীতি না থাকলে, অর্থাৎ জীবনচর্যার নীতি প্রতিষ্ঠা করা না গেলে নৈতিকতার আশ্রয় থেকে আমরা বঞ্চিত হব। জীবনের পরতে পরতে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নৈতিকতার সৌকর্য কলা যোজনা করে নান্দনিকতার ঐশ্বর্য অর্জন করার মধ্য দিয়েই জীবন শিল্পের পরিসর সমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। জীবন ও জগৎ একযোগে সমৃদ্ধতর হবে নৈতিকতার ও নান্দনিকতার স্নিগ্ধতায়।

www.nagorikpathagar.org

মধুসূদন দত্তের 'কবি' 'কবিতা' ও 'কল্পনা'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেঁচেছেন মাত্র (১৮২৪-১৮৭৩) উনপঞ্চাশ বছর। এই স্বল্পকালীন সময় পর্বে তাঁর মতো বিশাল প্রতিভার অধিকারী আমাদের চোখে পড়ে না। প্রতিভার মূল্যায়ন আয়ুষ্কালের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে তার শিল্পকর্মের শক্তি, গুণপনার ওপর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব।

খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁর জীবনে অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়িতে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মূর্তি তাঁর হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করতেন, কোথায় বেড়াতে ভালোবাসতেন, পূর্ণ বয়সে তা তাঁর সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ির রাস্তাগুলো পাকা করে বাঁধাবেন, কপোতাক্ষীতে একটি অবতরণিকা প্রস্তুত করবেন এবং তার কূলে 'মাইকেলোদ্যান' নামক একটি উদ্যান নির্মাণ করে সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবেন, এটা তাঁর প্রার্থনা ছিল। তা জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিলাষের ন্যায় কোনোটিই পূর্ণ হয়নি। বহুকাল প্রবাসের পর একবার সাগরদাঁড়িতে এসে বলেছিলেন 'কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায় সেও পরম সুখী।' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত-যোগীন্দ্রনাথ বসু)

মধুসূদনের প্রবাস জীবন যে তার সৃষ্টিশীলতাকে জীবিত রেখেছে সেটা বলার বড় রকমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ফরাসি দেশের হিমশীতল প্রকৃতির ছায়ায় বসে জননী জন্মভূমির মোহিনীমূর্তি অঙ্কন করেছেন 'কপোতাক্ষ'কে উদ্দেশ্য করে।

কপোতাক্ষ নদ

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

www.nagorikpathagar.org

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ- স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশপ্রেম তাঁর জীবনেরই অগ্নিসাক্ষী। জীবন যখন স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জীবন মৃত্তিকা পায় না, শেকড় চারিয়ে বহু দূর বিস্তৃত হতে পারে না- সে জীবন প্রাণের রস সঞ্চয় করতে পারে না যথার্থভাবে। জীবনের আলকিমি-রসায়ন তো মৃত্তিকার গভীর গহ্বর, হৃদয়ান্তঃপুর। মধুসূদন সে অন্তঃপুর থেকে যখনই বিচ্ছিন্ন হয়েছেন স্বজাতিক সংস্কৃতি থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এ বিচ্ছিন্নতার জন্য তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। সে খেসারতটা ছিল বড় রকমের। মধুসূদনের জীবন পদ্ধতি তাঁর জীবনদর্শন থেকে কোনো কোনো সময় বিচ্যুত হয়। ফলে তাঁর জীবন প্রবাহে নেমে আসে মারাত্মক বিপর্যয়। তিনি জীবন দিয়েছিলেন স্বাদেশিক জীবনের বিশাল অধ্যায়ের সূচনা করে। কবি তাঁর নিজ দেশ থেকে, নিজ ঐতিহ্য ভাণ্ডার থেকে লাভ করেন- কড়ি, কমল, কামিনী, সুবর্ণ কিরণ কুসুম, মৃদু কলকলে সমবর্তী নদী। এ সমস্ত বহুলতা আছে, বৈচিত্র্য বৈভবও আছে। তাঁর 'কবি' কবিতাটি তর জীবনের সেই মাতাল স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধান দেয়।

"কে কবি- কবে কে মোরে? ঘটকালি করি
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী ভানু প্রসা সুদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে,
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;

www.nagorikpathagar.org

মরুভূমে তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে! "।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের কাব্যমঞ্চে আধুনিকতার প্রথম 'কুসুম সৌরভ' ছড়িয়ে দিলেন। সে কাব্য সুষমা ছড়িয়ে পড়ল বাংলার দিগন্ত থেকে দিগন্তে। মধুবন থেকে মধুসূদনের উদ্যান উপত্যকায় সর্বত্র তিনি নির্মাণ করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। বাংলা কাব্যের গঠন পদ্ধতি একেবারে পাল্টে দিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করলেন বাংলা সনেট।

এ প্রসঙ্গে মধুসূদন গবেষক ও কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন- "মধুসূদন শুধু কবি বলেই আধুনিক বা আধুনিক বলেই মহৎ কবি নন, তাঁর আধুনিকতা ও মহত্ত্ব সমকালের পটভূমিতেই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও তাৎপর্যময়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্‌গাতা। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণ, বাংলা কাব্যের পঠন রীতির পরিবর্তন, বাংলা সনেট প্রবর্তন, সুমিত স্তবক বিন্যাসরীতি ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যথার্থ সুরে প্রবহমান রচনা মধুসূদনের কীর্তির অন্যতম। কিন্তু আঙ্গিকেই এই সচেতনতাই শুধু নয়, বিষয় নির্বাচনে ও নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মধুসূদনের সচেতনতা ও সাফল্য বিস্ময়কর।

মধুসূদন পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে প্রকাশ করেছিলেন তার সুপরিচিত পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য হিন্দুদের হিন্দু-ঐতিহ্যে সচেতন করে তোলা। এই প্রয়োজনে তিনি হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে যেয়ে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলমান চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করেন। তাঁর কাব্যে 'স্বাধীনতাহীন' গ্লানির কথা আছে, তা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই; তবে কোনো কোনো সমালোচক যেমন একথা ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্থানের আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তা সম্ভবত কষ্ট কল্পনা। কেননা রঙ্গলাল যবন নিধনের গান বিশুদ্ধ মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ। কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা করবার কোনো সচেতন অথবা অসচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল এ রকম প্রমাণ মেলে না। পরন্তু পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের শেষে তিনি কৃপা ভিখারী।

[মধুসূদন/মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান]

www.nagorikpathagar.org

"অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী রোধিলা বিধি কর্ণ পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি, সম-ভাব তারা।
মনের উদ্যান মাঝে কুসুমের সার
কবিতা কুসুম-রত্ন। দয়া করি নরে
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।
দুর্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা অমৃত রসে। হায়, সে দুর্মতি
পুষ্পকুলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম পদ্মবাসিনী ভারতি।
কর পরিমলময় এ হিয়া সরোজে
তুমি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।"

মাইকেল উপর্যুক্ত কবিতায় পদ্মবাসিনী ভারতির চরণ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য অর্পণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন এ যেন 'হৃদি সরসিজ'। আরেক কালান্তর-জীবনের কালের পর্বে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কবিতা' কবিতাটি নিঃসন্দেহে জীবনরূপ উন্মোচনকারী কাব্যিক প্রয়াস। দৃশ্যপটের অন্তরালে যে দৃষ্টি, জীবনের অভ্যন্তরে যে গভীর জীবন সেই জীবনের সমস্ত অন্তরাল উন্মোচন করার জন্য ভেতরকার অন্ধত্ব ঘোচানো আবশ্যক।

'মধুসূদন কবি-আনন্দ কবি' তিনি বিদ্রোহ যন্ত্রণা এষণা-বাসনা, সুখ-দুঃখের বিশাল জলধি অতিক্রম করছেন 'মানব আততি'র অবিচ্ছেদ্য আন্তরিকতায়।

মধুসূদনের 'কবি' 'কবিতা' আর 'কল্পনা' মানব-মোহনার একই অখণ্ড উৎসে এসে মিশে গেছে। কবির 'কল্পনায়' 'বাগেদবীর প্রিয়সখি' কোথায়? কবির যাতনা এখানে ভীষণ কাতররূপ ধারণ করেছে। কোথায়? কোথায়? কোন গো কুল কাননে? রাধাকান্ত হরি সেখানে নৃত্য করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

"লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি এই ভিক্ষা করি
হায় গতিহীন আমি দৈব বিড়ম্বনে;
নিকুঞ্জ বিহারী পাখি পিকুর ভিতরি।
চল যাই মহানন্দে গোকুল কাননে
সরস বসন্তে যথা রাধাক্রান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে
পূরি বেণুবরে দেশ। কিংবা শুভঙ্করি,
চল গো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ পতি
কিংবা সে ভীষণ ক্ষেত্রে যথা সরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।
কি স্বরগে কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, লহে তব গতি।"

'স্বরগে' 'মরতে' অতল পাতালে জীবনের ডাঙ্গা কোথায়? মধুসূদন বিপুল অস্থির চিত্ততায় সেই মানব পাথার সন্ধান করছেন। এ তাঁর অনন্ত অন্বেষা।

www.nagorikpathagar.org

নোবেল লরিয়েট সোলঝেনিৎসিন

১৯৭০ সাল।

নোবেল লরিয়েট সোলঝেনিৎসিন নোবেল লেকচার দিতে স্টকহোম যাননি। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে যেতে দেননি ওখানে ভাষণ দিতে। এ প্রসঙ্গে সোলঝেনিৎসিন লিখেছেনঃ

"For a country to have great writer is
like having another government
That's why no regime has ever loved.
great writers, only minor ones."

[Alexander Solzhenitoyn,
The first circle.]

ব্যক্তিই সমাজের বুনিয়াদ নির্মাণ করে। কিন্তু সমাজ ব্যক্তির বুনিয়াদ হতে পারে না শেষ বিচারে। ব্যক্তির বিশ্বাস যখন গোটা সমাজের বিশ্বাস অঙ্গীকার করে সেখানে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ করে দিতে বাধা কোথায়? কারোর জন্য কোনো অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না তা। ব্যক্তি সমাজের নিয়ামক, ব্যক্তি রাষ্ট্রেরও নিয়ামক। কাজেই ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ফায়দা কোথায়? বরং বৈরিতা বাদ দিয়ে বন্ধুত্ব সখ্য তৈরি করে নেয়া নিঃসন্দেহে শ্রেয়তর।

সোলঝেনিৎসিন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির প্রাক্কালে তাঁর লিখিত ভাষণে একটি রুশ প্রবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন,

"One word of trust shall
Outweigh the whole world."

এই প্রবাদ সোলঝেনিৎসিনের জীবন সংগ্রামের আগুনকে উসকে দিয়েছিল। আরও দীপ্রতর করে তুলেছিল। তাঁর শিল্পের নৈতিক শক্তিতে এনেছিল পরাক্রম বিশ্বাস। চল্লিশোর্ধ্ব কাল সময় ধরে এই রুশ লেখক তাঁর জাতির ইতিহাসের স্মৃতিকে বহন করে

www.nagorikpathagar.org

এনেছেন, ছিনিয়ে এনেছেন রুষ্ট-সোভিয়েত 'অথারিটি'র' হিংস্র ছোবল থেকে। জাতির মহান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে বিকৃত ও বিলুপ্ত করে দেয়ার খল-চক্রান্তকে রুখে দাঁড়িয়েছেন বিবেক আর ব্যক্তিত্বের শক্তি দিয়ে। 'নোবেল লেকচারে', তিনি দস্তয়েভস্কির একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেছিলেন- "Beauty will save the world" এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন– "What does this mean? Fore a long time I thought it merely a phrase. Was such a thing possible? When in our bloodthirsty history did ever save any one from anything? Ennobled elevated, yes; but whom has it saved? Literature transmits... condensed experience from generation to generation."

এ কথাগুলো সোলঝেনিৎসিন আত্মস্থ করে নিতে পেরেছেন অনায়াসে। আর আস্তে আস্তে তিনি নিজেই হয়ে পড়েছেন রুশ জাতির জীবন্ত স্মৃতি। ৬০-৭০ এর দশক থেকেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রুশ রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে সোলঝেনিৎসিন মহা-সংগ্রামে (epic struggle) অবতীর্ণ হন। তাঁকে স্তব্ধ ও হতদমিত করার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যেতে থাকে এবং তাঁর পক্ষেই বিশ্ববিবেক জাগ্রত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হবার পর তিনি পশ্চিমা দুনিয়ায় বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যাখ্যাত হতে থাকেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে আধুনিক মাধুসন্ত হিসেবেও আখ্যা দেন। কেউ কেউ ভাবেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবেও। আসলে তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাই। তিনি তাঁর স্বাপ্নিক চোখ এবং বিদ্রোহী সত্তার আলো দিয়ে যে মানুষ, যে-মুক্তি, যে-স্বাধীনতা, যে ভালোবাসার পৃথিবীর রূপরেখা অঙ্কন করেছেন- সে পৃথিবী সামনে। হয়তো এখনো অনেকটা দূরেই– তবে সে পৃথিবী ধীরে ধীর তাঁর করতলগত হবে একদিন। তার ভালোবাসার 'Lyatia' কে ক্রেমলিনের হার্মাদরা নির্দয় নিষ্ঠুর পধসঢ় ৎবমরসব এর বলী করেছে। ইতিহাস ঐ বর্বরতার প্রতিশোধ নেবেই-এ স্বপ্নে সোলঝেনিৎসিন বিশ্বাসী।

সোলঝেনিৎসিন তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'The First Circle' -এ বলেছেন :

"For a country to have a great
writer is like having another government
That's why no regime has ever loved
great writers, any minor ones."

www.nagorikpathagar.org

ক্রেমলিন প্রাসাদের প্রভুরা দীর্ঘকাল ধরেই মহৎ ও প্রধান লেখকদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ করা গেছে যে, টলস্টয় দুর্ভিক্ষ এবং ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী উচ্চকিত করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছে। জার শাসকের এতে করে টনক নড়ে গেছে। কম্যুনিস্ট শাসনের পাদভাগে কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর সমস্ত খ্যাতিকে প্রয়োগ করেছেন রুশ জনগণকে রক্ষা করতে এবং নিরাপদ রাখতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুটা ছিল রহস্যাবৃত। বরিস পাস্টারনাকও একটি অদৃশ্য সরকার গঠন করেছিলেন স্বৈরশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। যদিও ক্রুশ্চভ তাঁকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করাতে বিরত রেখেছেন। কিন্তু কেউ তো আর প্রতিবাদকে কোনো দন্ত গিয়ে ঘষে তুলে দিতে পারে না। আমরা তাঁর মহাগ্রন্থ Doctor Zhivago- তে দেখি:

> "They only ask you to praise what
> you write most and to grovel before
> what makes on most unhappy."

প্রাসাদের প্রভুরা কেবল নিরঙ্কুশ প্রশংসাই দাবি করত। আর প্রত্যাশা করত যেন সব মানুষই মাটির ওপর বুক পেতে দিয়ে লুটিয়ে চলে। এই মাটিতে বুক পেতে দিয়ে লুটিয়ে চলা বরিস পাস্টারনাকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের পক্ষে তো আরও নয়। বরং বিদ্রোহের ধ্বজা উঁচিয়ে তুলে ধরেছেন মহানায়কের মতো। সোলঝেনিৎসিন একা, অনেকের এবং সকলের পক্ষ নিয়ে। রাশিয়ায় লেখকদের প্রভাব-প্রতাপ বড় মারাত্মক। ক্রেমলিনকে তটস্থ থাকতে হতো সবসময়। সর্বাত্মক একনায়কত্ববাদী সমাজের লেখকদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি দুনিয়ার অন্য কোনো প্রান্তে গিয়ে অনুরণন তুলতে পারত না। কারণ, প্রাসাদের সেই প্রাচীরের সমতলেই ছিল কালের কাঁটাতার। ওগুলো ডিঙ্গানো ছিল প্রায় একরকম অসম্ভব। অকল্পনীয়। অস্বাভাবিকতা যে অপ্রাকৃত সেটা মানতে চাইত না ক্রেমলিনের কর্ণধারগণ। কিন্তু কবিরা, লেখকরা তাদের সামনে, জনগণের দিকে তুলে দেয়া কোনো দেয়ালই মানতে পারেন না। তারা তাদের শাণিত বিবেকের কাছে অন্য যে কোনো অস্ত্রকে ঠুনকো করে দেখেন। ভঙ্গুর বলে বিশ্বাস করেন। স্বৈরবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় লেখকদের নাকে খত দেওয়ানোর নির্দেশ জারি থাকে। কিন্তু বিবেকের

www.nagorikpathagar.org

পুরোধা পুরুষেরা পারেন না সেটা কস্মিনকালেও। ক্রেমলিনের হর্তাকর্তারা যত বেশি গর্জেছেন তত বেশি করে তাদের ক্ষমতার হাতল নড়বড় হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত লেখক সংঘ ছিল 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসের প্রটোটাইপ'। কোনো বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোনো 'রা' ছিল না। ছিল না ভেতরকার কোনো উচ্চবাচ্য। ইয়েভগেনি ইয়েভমুশেঙ্কো, সাগেই এসেনিন, আঁদ্রেই ডজেন জেনেস্কি প্রমুখেরা সাময়িক প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিশেষ 'এত্তেলা' পেয়ে থেমে গেছেন। সোলঝেনিৎসিন একাই কিন্তু অনেকের, অধিকাংশের হয়ে বজ্রের মতো গর্জে উঠতে পেরেছেন তাঁর স্পর্ধা ক্রেমলিন প্রাসাদের চূড়া স্পর্শ করে গেল। তিনি লক্ষ মানুষের যন্ত্রণার কথা ঘোষণা করলেন। নিপীড়িত মানবাত্মার স্বপ্ন, স্বাধীনতা ও ভালোবাসার কথা উত্থাপন করলেন। সমগ্র রুশবাসীর পক্ষে দাঁড়িয়ে। সোলঝেনিৎসিনের লেখনী হয়ে গেল বিদ্রোহী সংগীন। বিবেকের জাগ্রত তর্জনী। কে আর রুখবে এ শোণিত সংগ্রামের ফল্গুধারা? মানবার্তির অন্তঃসলিলে নিমজ্জিত হলো রুশ জনগণ। সোলঝেনিৎসিনকে আত্মার সুহৃদ করে নিলেন তারা।

রুশ মুলুকের সবচেয়ে শক্তিধর, জীবিত গদ্যশিল্পী আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন। 'One Day in the Life of Ivan Denisovich' (ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন) তাঁর জীবনের যন্ত্রণা সেঁকা একটি উপন্যাস। এ উপন্যাস প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯৬৮, ২৭ সেপ্টেম্বর, সাপ্তাহিক টাইম সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে, "To his friends, he is vigorous burly, bearded men with a booming voice possessed equally by his love for Russia and his passion for freedom. To the Stalinists, his enemies, he is the archaccuser, the self-appointed prosecutor, blackening Russia's name abroad. His works blear with the indignation of man who knows his enemy: he spent eleven years in prison, slave-lobor camps and exile. His books as one of the establishments tame writers once charged, are more dangerous for us than there of Pasternak, Pasternak was a man detached from life. while Solzhenitsyn is combative, determined."

www.nagorikpathagar.org

সময় ও ইতিহাসের ক্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সমালোচক সোলঝেনিৎসিনকে বিচার করতে চেয়েছেন। কেউ কেউ বিচার করছেন তাঁর মানব প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিক মানসিকতার কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করে।

"University of California-i Renaissance literature-এর অধ্যাপক Ronald Berman বলেন, Solzhenitsyn poses a problem different from that of most men of letters who comment on public affairs. Words worth lived long enough to repent his views on the French Revolution; show year's and pound retained their reputation, despite their political beliefs. Very few artists or novelists house managed to affect the world because of their political beliefs. Solzhenitsyn has insisted on mankind his ideas of culture and politics central to his work- in fact, they are the work itself."

সোলঝেনিৎসিন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর কথাশিল্পী এ কথা Ronald Berman অকপটে স্বীকার করেন। সোলঝেনিৎসিন এক মহান মানব ব্যক্তিত্ব, এটা মেনে নিয়ে তিনি আরও বলেন, "We respond to his art because he is a great man, on the scale of many a martyr or saint. His fiction matters to us because it is historically persuasive, because it seems true."

'ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন' (One Day in the Life of Ivan Denisovich) এই উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীগণ বিস্মিত হলো। এই উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এই উপন্যাসে সোলঝেনিৎসিন নির্যাতিত মানবাত্মার মথিত বাণী ও যন্ত্রণাকে উচ্চকিত করেছেন। 'Soviet totalitarian system'-এর পাথুরে প্রাচীরের অন্তরালে যে মানব পীড়ন দেখেছেন, বন্দি আত্মার আর্তস্বর শুনেছেন-সোলঝেনিৎসিন জীবনের অকৃত্রিম হার্দিক মমতা দিয়ে সেই মন মানুষের আর্তি ও আততিকে প্রতীকায়িত করেছেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র খর্ব-খণ্ডিত করলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই খণ্ডিত হয়। এই উদার, মানবিক দাবিটাই হলো সোলঝেনিৎসিনের জীবন সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু। মুক্তি, স্বাধীনতা ও সত্যের প্রতীক পুরুষের সেই লক্ষ্য জয়ের সংগ্রাম যে নিরন্তর

www.nagorikpathagar.org

সেটা বিশ্ববাসী সচেতনভাবে লক্ষ করছে। রুশ বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকীর স্তবগান উপলক্ষে চতুর্থ সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে সোলঝেনিৎসিন কিংবা অন্য কোনো ভিন্ন মতাবলম্বীকে বক্তৃতামঞ্চের ধারেকাছে যেতে দেয়া হয়নি। সুতরাং সোলঝেনিৎসিন পত্রাকারে এর প্রতিবাদলিপি গোপনে বিলি করেন ডেলিগেটবৃন্দের কাছে এবং সেটা আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। পত্রের নমুনা নিম্নরূপ :

"Since I am unable to speak from the platform. I would ask the Congress to consider the oppression to wthich our literature has for decades and decades been subjected on the part of the censorship-the censorship for which there is no provision in the constitution on and which is therefore illegal. the censorship that never passes under its own name and gives literacy illiterates arbiteraey power our writers. There is no recognition of the right to our writers to state publicly opinions about the moral life of men and society to elucidate in their own way the social problems. or the historicl experiences that have so profoundly affected our country."

এগারো বছর বন্দি থাকার পর তিনি ১৯৫৬ সালে মুক্তি পান। তার এক বছর পর তাঁকে 'পুনর্বাসন' দেয়া হয়। কাজাখস্তানে নির্বাসনে থাকার সময় সোলঝেনিৎসিন বেঁচে নেই, এই ভেবে তাঁর স্ত্রী নাতালিয়া আবার অন্য পুরুষকে বিয়ে করেন। নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর নাতালিয়া তাঁর কাছে ফিরে আসেন।

সোলঝেনিৎসিনের প্রধান রচনাবলি

One day in the life of Ivan Denisovich. 1963
For the good of the cause, 1964
We Never Make Mistakes, 1963
Olen's Shalashovkd (play) 1968
The Love girl and the Innocent. 1963
The Cancer Ward. 1968
The First Circle, 1968

www.nagorikpathagar.org

August 1914, 1971

Stories and Prose Poems, by Alexander Solzhenitsyn. 1971

Novel Lecture by Alexander Solzhenitsyn. 1972

The Gulag Aracipelago, 1972

Letter to Soviet Leader, 1974

Prussian Night: A poem, 1977

Amerikanski rechi (essays), 1975

The Oak and the Calf, 1975

From under the Rubble (with other) (essays) 1975

entente : Prospect for Democracy and Dictatorship [with others] (essay) 1976

Lenin in Zurich (Novella) 1976

Victory Celebration : A Comedy in Four Acts.

Prisoners : A Tragedy (plays) 1983

Oktyabr Shestnadtsatogo (novel) 1984

March 1917 (novel) 1986-87

Rebuilding Russia : Reflection and Tentative Proposals. 1991

সোলঝেনিৎসিন একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, ফিকসন লেখক এবং আত্মচরিত রচয়িতা। তাঁর নাটক সম্পর্কে Tatyawa Tolstaya বলেন :

"Solzhenitsyn unconsciously and instinetively submerged himself in myth. But, as often happen with Russians. he overdid it. His drama..... lies precisely in his Russian-ness in the fact that he so completely and without any doubt identifies himself with Russia being flesh of its flesh and blood."

সোলঝেনিৎসিন, প্রথম এবং শেষত একজন মানুষ এবং মানুষ। রুশ-রাজনীতির হাঙ্গর যখন বিশালকায় মূর্তিতে হা করে ব্যক্তির অস্তিত্ব গিলবার জন্য উদ্যত, মেঘকুয়াশায় রুশ-চরাচর যখন ঢেকে দেয়া হয়েছে ইতিহাসের মহানায়ক, শতাব্দীর মহাপুরুষ

www.nagorikpathagar.org

আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন স্বৈরশৃঙ্খলে বন্দি রুশবাসীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন একাই। অগণিতের সীমিত, অসীম শক্তির উৎস পুরুষ হবে। সোলঝেনিৎসিনের স্বপ্ন বাস্তব হবে হয়তো, অচিরকালের মধ্যেই।

সোলঝেনিৎসিনের স্বপ্ন কি?

সমস্ত মানুষ, সমস্ত মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মনন ও প্রঙ্গার স্বাধীন হবে। সোলঝেনিৎসিনের স্বপ্ন এটাই। ব্যক্তি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবে। সে বিশ্বাস গিয়ে পড়বে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও সমগ্রে। সেই আলোকতোরণ আগামীর জন্য সোলঝেনিৎসিন এখনও স্বপ্ন দেখছেন।

সত্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবহিতৈষণা আর মানবাধিকারের মানসপুত্র আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন জীবনভর লড়াই করে চলেছেন। রাষ্ট্র আর প্রাসাদের তাঁবেদারদের কোনো জুলুমই তাঁকে এতটুকু হতোদ্যম করতে পারেনি। কাবু করতে পারেনি তাঁর কণ্ঠকে। স্তব্ধ করতে পারেনি তাঁর আত্মার মন্থিত বাণী। তাঁর লেখনী সব্যসাচী, সংশপ্তক মানুষটিকে পাগলাগারদের অভ্যন্তরে শ্রম শিবিরে দার্ষদ দেয়ালের ভেতর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পুরে রেখেছিল শান্তি ও সভ্যতার 'দেবতারা'। মায়ের মৃত্তিকাভূমি থেকে নির্বাসিত করে রেখেছিল বিশটি বছর ধরে তাকে।

সোভিয়েতের পট পরিবর্তন হলো। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল স্বৈর-সর্বাধিনায়কত্বের লৌহ-শৃঙ্খল।

আজ স্বভূমি-স্বদেশ মাতৃদেশে ফিরে এসেছেন এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী পুরুষ সোলঝেনিৎসিন। স্বাগত, সোলঝেনিৎসিন স্বাগত।

www.nagorikpathagar.org

পাজের পরাব্যাজস্তুতি

অক্টাভিও পাজ জন্মেছেন ১৯১৪ সালে। মেক্সিকো সিটিতে। ল্যাটিন আমেরিকার এই প্রধান কবি আজ গোটা পৃথিবীর কবি। তাঁর মনুষ্যত্ববোধ ও সংস্কৃতি তাঁকে মহান করে তুলেছিল। গত ১৮ এপ্রিল তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকের অমর তীর্থযাত্রী হলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত। শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি হৃদয়ের আর্ত পুষ্পস্তবক দিয়ে। আধুনিক বিশ্বের এই মহান কবি পুরুষকে আমরা স্মরণ করি হৃদয় শোণিতের প্রবহমান অস্তিত্বে।

"One of Latin America's greatest bring poets Octavio Paz here explores a range of topies both close to the heart and International in scope. From his fierece struggle to reconcile his country's past and future with the modern world, to his grave ecastatie meditaions on `reality' and consciousness and his impassioned search for innocence and love. His poperty allows us to glimpse a different, future place..... liberating and affirming."

–James Woods.

পৃথিবীবাসীর আদি ইতিহাস, বিপ্লব, মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়, সমাজ, রাজনীতি- এরকম বহুমাত্রিক বিষয় পাজের শিল্পের ভূগোলকে বহুরৈখিক করে তুলেছেন। এ অনন্যতায় পাজ অবশ্যই অনন্য। পাজের মেধার রশ্মি ও চিন্তা সমুচ্চয় আজ পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে যে শব্দাবলি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আর ঐ শব্দ শরীরের বাকপ্রতিমা কবির কবিতার অস্তিত্বের চিত্ররূপটি ক্রমানগত ভাস্বর করে তুলতে থাকে। শব্দাবলিই কবির অস্তিত্বের রক্তমাংসের বীজসূত্র "Each time we are served by words, we mutilate time, But the poet is not served by words. He is their servant. In serving them, he returns them to the plenitude of their nature, makes them recover their being"

[Oetavia Paz. El Arco Y Lalira, Translation : Rooth Syms P-37]

www.nagorikpathagar.org

পাজ বলেছেন, কবিরা শব্দের বার্তাবহ। শব্দের ভেতরকার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, বর্ণচ্ছটা তারা খুঁজে বের করেন। শব্দের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই পুনঃস্থাপন করেন তাদের সম্পূর্ণ-সমগ্রতা। শব্দাবলির অস্তিত্বের মধ্যে সচল, সবাক ও সজীবন্ত করে তোলেন। শব্দেরা যেন তাদের নিজেদের সত্তার ভেতরই বসবাস করে। শব্দের সত্তার অন্তর্নিহিত ধ্বনি আবিষ্কার করেন একজন কবি। শব্দের অস্তিত্বের ধ্বনিময়তার সুষম সমন্বয় ঘটান কবি। পাজ এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গরুত্ব আরোপ করেছেন। 'শব্দই' যেন সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। প্রতিটি ক্ষণ, পল, অনুপল। শব্দের মুহূর্তকে ধারণ করে জীবন অবলম্বন করা খুবই কঠিন কাজ। আর শিল্পের হর্ম্য বানানো আরও দুরূহতর। অক্টাভিও পাজের জন্ম এক বনেদি, বিপুল ঐশ্বর্য সময় পরিবারে। স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখলেন :

"We lived in a large house with a garden. Our family had been impoverished by the revolution and the civil war. Our house, full of antique furniture. books and other objects, was gradually crumbling to bits. As rooms collapsed we moved the furniture into another. I remember that for a long time I lived in a spacious room with part of one of the walls missing. Some magnificent screens protected me inadequately from the wind and rain. A creeper invaded any room..."

[Interview with Rite Guibert, Seven, Voices. N. Y: Knof. 1973]

পারিবারিক সূত্রেই পাজ বিপ্লবের নিশানটি হাতে পেয়েছিলেন। পাজের উপর্যুক্ত স্মৃতিচারণার নস্টালজিক আর্তি ও আততির মধ্যে তার পরিবারে ঐতিহ্যের বীজকণা অর্থাৎ পত্নভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। এ থেকে তার মানসিক গঠন ও প্রক্রিয়ার প্রতিভাস পাওয়া যায়। পাজ ছিলেন প্রতিবাদী, বিপ্লবী। সময়ের অন্ত্রনালী কেটে ছিঁড়ে নতুন সময়ের হৃৎপিণ্ড সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। বিপ্লবী ঘরানা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে গিয়ে পাজ পথ হারাননি। পথের ধুলোতে বসেই মুঠি মুঠি ধুলোকণা তুলে নিয়েছেন। জীবনের প্রান্তরে প্রান্তরে মেশাতে চেয়েছেন সেটা। কতখানি সম্ভব হয়েছে সেটা নিরূপণ করতে পারবে মহাকাল। পাজ পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যতন মানুষকে পর্যবেক্ষণ করছেন। পাজকে প্রতীকী পরাবাস্তবাদী এবং রূপকল্পের কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অক্টাভিও পাজ পৃথিবীর ম্যাপের মতো একজন কবি। কূটনীতিক। সমালোচক। প্রতিবাদী চিন্তাবিদ। তিনি সময়ের পুরোভাগে গিয়ে কথা

www.nagorikpathagar.org

বলতেন। মানবিক বাণী উচ্চারণ করতেন। মুক্তচিন্তার পুরোধাপুরুষ পাজ খোলাখুলিভাবে পৃথিবীকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়ে মানব সমাজের স্খলন ও পতন শনাক্ত করতেন। তিনি একজন মার্কস্‌বাদী দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ও বাস্তবতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Irany and Compassion-এ বলেছেন।

বিশ শতকের ইতিহাসের পরিশেষ হলো রাজনীতি ও সমাজদর্শনে অপরিমেয় শূন্যতা। এটি শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি। তিরিশের দশক শেষ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত, আমিও ধারণা পোষণ করতাম যে, সমাজে ক্রমবর্ধমান অন্তর্সংঘাত মিটিয়ে ফেলার একমাত্র উপায় হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু এরপর থেকে আমরা ১৯৭১ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ঘটিত পরীক্ষামূলক মতবাদটির ব্যর্থতাই দেখে আসছি শুধু। এটি একটি সামাজিক ব্যর্থতা, কারণ সমাজতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা। কারণ যেটা ধারণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সম্পদের যথার্থ উৎপাদন এবং সুষম বণ্টন, সেটা বাস্তবে ঘটেনি। সুতরাং বলশেভিক বিপ্লবের একমাত্র ফসল সেনাবাহিনী কিংবা দমনমূলক রাজনীতি।

পাজের মানবিক বোধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা উচ্চমার্গীয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বিগত শতাব্দীর সমস্ত শাসন পদ্ধতির পতন স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শিল্প সংগঠন করছে আমলাতান্ত্রিকেরা, যেমন মেক্সিকোতে। পাজের এই উক্তির সত্যতা পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। পাজ এখানেই বলেছেন, 'আমরা আজ পারমাণবিক মৃত্যু এবং পরিবেশ দূষণের হুমকির মুখোমুখি। এ হুমকির মুখে বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতা একবারেই অসহায়। আমরা পুঁজিবাদ কিংবা সমাজতন্ত্রের ফল বলতে? এগুলো বরং আধুনিক সমাজ সভ্যতার শস্য। পারমাণবিক বোমা এবং পরিবেশ দূষণ। মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরিণাম, কোনো ভাবাদর্শ থেকে? হয়নি। কঠিন বাস্তবতাই ভাববাদকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ধারালো? পাজ ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন 'এ বিরাট ঐতিহাসিক শূন্যতার যুগে একমাত্র গণতন্ত্রই মানবজীবনে আশার চিহ্ন দেখিয়ে যাচ্ছে। তবে গণতন্ত্র সর্বরোগের ওষুধ নয়। এটি সংঘবদ্ধ একটি প্রয়াস। পরস্পর মারামারি, খুনোখুনি থেকে মানুষকে বিরত রাখার একটি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনের সময় শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা।' ...'আমি এমন এক সময়ের আশা করছি, আমার বর্তমান সাতাত্তর বছর বয়স নিয়ে সম্ভবত সেদিনটি দেখে যেতে পারব না,

www.nagorikpathagar.org

যখন সমাজতন্ত্র ও উদারতাবাদের সমন্বয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দর্শন জন্ম নেবে।' পাজ এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর ২১ বছর আগে। এ বছরই ৯৮'-র ১৮ এপ্রিল লোকান্তরিত হয়েছেন। এই ধূলি ধূসর রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবী ও সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন অন্য একটি আনন্দলোক-মঙ্গললোকে। যেখানে মানুষমাত্র সকলকেই যেতে হয়। যেতে হবে এর মধ্যে ব্যত্যয়, ব্যত্যস্ত নেই।

পাজ বলেছেন, " ...আমরা এক নিরানন্দ ও অস্বস্তিকর সময়ের সন্তান। সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও সমবেদনার অভাব বড় প্রকট আমাদের মধ্যে। আমার মতো অনেকেই জানেন ব্যাজস্তুতি সমালোচনা একটি কৌশল।" এ প্রসঙ্গে পাজ আরও বলেন, "এ ব্যাজস্তুতি বা শ্লেষ অতিক্রম করে যায় শ্লেষকেও। নিজকে ঠাট্টা করার মধ্য দিয়ে বাতিল করে নিজকে। শ্লেষ সময়ধর্মী; বস্তু নির্ভর পৃথিবীর মধ্যে জঘন্য নিরাবেগ ব্যক্ততার প্রতি আমাদের আত্মার প্রতিক্রিয়ার শিল্পরূপ। শ্লেষবাদী মানুষ অপরকে ব্যঙ্গ করে। তবে এর মধ্য দিয়ে নিজেকেও ঠাট্টা করে সে। আর নিজকে ঠাট্টা করার মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানব সভ্যতার প্রতি তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। এটিকে আমি বলব পরাব্যাজস্তুতি। ব্যাজস্তুতিকে বা শ্লেষকে যদি নির্দয় বলি, তাহলে পরাব্যাজস্তুতি নির্দয়তাকে করুণা ও সহানুভূতিতে দ্রবীভূত করে।" পাজ বিশ্বাস করেন, এই নান্দনিক বোধ নৈতিকতা ও রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে ক্রমশ। সভ্যতার দুঃশাসন দূর হবে।

January fist- কবিতায় পাজ

"The going doors open
like those of Language,
Terminal the unkown.
last night you told me; tomorrow
We shall have to think up signs,
sketch a landscape, fabricate a plan
on the double page
of day and paper
we shall have to invent

www.nagorikpathagar.org

once more,
the reality of this word."

"বছরের দরোজাগুলো খোলা
ঠিক তেমনি যেরকম ভাষার দরোজাগুলো
ভাষা এগিয়ে চলে অজ্ঞাতের দিকে।
গত রাত্রে তুমি আমাকে বলেছিলেঃ
'আগামীকাল'
আমাদের নতুন করে প্রতীক চিহ্নের কথা ভাবতে হবে
একটি প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য আঁকতে হবে
একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে
দ্বৈত দিবস আর কাগজের পাতায়।
আগামীকাল, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে আমাদের
নতুন করে এ পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে।"

"I opened my eyes late.
For a second of a second
I felt what the Aztec felt,
On the crest of promontory,
lying in wait
for times's uncertain return
through cracks in the horizon."

"আমি আমার চোখের পল্লব খুলেছিলাম দেরিতে
একটি সেকেন্ডের এক সেকেন্ডে
আমি ভেবেছিলাম আদিম আজতেক জাতির মতো
তারা অপেক্ষা করে শৈলান্তরীপের চূড়ায়
সময়ের অনির্দিষ্ট প্রত্যাবর্তনের জন্য

www.nagorikpathagar.org

এবং তারা দিগন্তের ফাটলের রেখাচিত্র দেখে।"

"But no, the year had return,
It filled all the room
and my look almost touched it.
Time, with no help from us
had placed
in exactly the same order as yesterday
houses snow on street,
Snow on the buses,
Silence on the snow. "

"কিন্তু ব্যাপর সেটা নয়, বছর আবার ফিরে এলো
ঘরটা ভরে ফেলল
এবং আমার দৃষ্টি তাকে প্রায় স্পর্শ করল।
সময় আমাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে
যেন বিগত দিনের মতোই রয়ে গেল
জনশূন্য রাজপথে সারি সারি গৃহ
"গৃহের ছাদের ওপর বরফ ছিল
এবং বরফ ছিল নিঃশব্দ, নীরব।"

"You were beside me.
still asleep.
The day had invented you
but you hadn't yet accepted
being invented by the day.
-Nor possibly my being invented, either.
You were in another day."

www.nagorikpathagar.org

"তুমি আমার পাশে ছিলে
আর ঘুমিয়েছিলে।
এদিনটি তোমাকে তৈরি করল
কিন্তু তুমি সেটা এখনও গ্রহণ করলে না
-সম্ভবত আমার অস্তিত্বও।
তুমি এখন অন্য একটা দিনে অবস্থান করছ।"

"You were beside me
and I saw you, like the snow.
asleep among apprearances
Time, with no help from us,
invents houses streets, trees
and sleeping women."

"ঐ দিনও তুমি আমার পাশে ছিলে
আমি তোমাকে দেখলাম বরফের মতো অনেকের মধ্যে
ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়,
সময় আমাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পায় না
সে গৃহ তৈরি করে, রাস্তা, বৃক্ষ তৈরি করে
এবং নিদ্রিত রমণী।"

"When you open your eyes
we'll walk once more,
among the hours and their inventions.
we'll walk among appearances
and bear witness to time and its Conjugations.
Perhaps we'll open the day's doors,
And then we shall inter the unknown."

www.nagorikpathagar.org

"যখন তুমি তোমার চোখের পল্লব মেলে দেবে
আমরা হাঁটব আবারও
সময়ের মুহূর্তের ভেতর এবং তাদের নির্মাণের মধ্যে,
আমরা হাঁটব একান্ত উপস্থিতির ভেতর।
সময়ের সাক্ষ্য রাখব এবং মিলন বন্ধনের।
এবং আমরা এরকম দিবসের দরোজা খুলে দেবো।
তারপর, আমরা অজ্ঞাতের তিমিরে প্রবেশ করব।"

অক্টভিও পাজ এক বিশাল দিগবলয়ের উন্মোচন করার প্রয়াস করেছেন, নিরন্তর। তিনি ক্রমাগতভাবে শূন্যতার সীমারেখা অতিক্রম করেছেন-জীবন ও জগতের পরিসর নতুনতর করে নির্মাণের লক্ষ্যে। রজনীর গভীর তমসাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন দিবসের জ্যোতির্ময় বলয়ের মধ্যে। দিবস ও রজনীর অর্গল ভাঙ্গার শব্দে দরোজা খুলে গেছে বারবার। তাঁর কবিতার শব্দ ও ভাষা অজ্ঞাতের 'অহেতুক অপচয়'কে জয় করতে গেছে বারবার। তাঁর কবিতার শব্দ ও ভাষা অজ্ঞাতের অহেতুক অপচয়কে জয় করতে চেয়েছে। 'দিবসের কাগজের পাতায়' নতুন নতুন নক্শা আর চালচিত্রের উদ্ভাসন লক্ষ করা যায় পাজের বক্ষ্যমান কবিতাটির দেহবল্লরি জুড়ে!

www.nagorikpathagar.org

অধ্যক্ষ আজরফের জীবনদর্শন

প্রত্যেক দার্শনিককে নিজের মতাদর্শের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে হয়। নিজের মধ্যে নিজের জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে সমস্যানিচয়ের সমাধান খুঁজে পেতে হয়। আর জিজ্ঞাসার ভেতর জবাব খুঁজতে গিয়ে যে সম্যক উপলব্ধির সূচনা করে তা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি।

মানব সমাজের ভবিষ্যতের সামাজিক মানচিত্রটি কি প্রকৃতির হবে সেটা বলা খুবই দুষ্কর। বিরোধ বৈরিতা এবং ব্যাজস্তুতির ওপর যে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত সে বিশ্ব সমাজ পরিবারের অস্তিত্ব যে কত ভঙ্গুর আপদগ্রস্ত সেটা বলাই বাহুল্য।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দর্শনের যুগান্তকারী একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথাটা শুরু করতে চাই। তিনি বলেন, 'জীবন ও সত্তার তাৎপর্য উপলব্ধিই দর্শনের লক্ষ্য। মানুষ যেদিন আত্মসচেতন হয়ে চিন্তা করতে শুরু করল তার মনে সেদিন দু'টি প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিলো; মানব জীবনের তাৎপর্য কি? যে বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে মানুষের বাস তার স্বরূপই বা কি? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মানুষ কতকাল নানাদিকে নানাভাবে হাতড়ে বেড়িয়েছে সে কথা আমরা জানি না, তবে খুঁজতে খুঁজতে যেদিন পথের হদিস পেল, তখন থেকে লক্ষ্য স্থির করে সে প্রশ্ন ও চিন্তার পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। সুসংবদ্ধ বিচার ও আলোচনার সেই থেকে শুরু। মানুষের বুদ্ধি যেদিন এই নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করল, সেই দিন দর্শনের জন্ম। দর্শনের ইতিহাসের সেই দিন গোড়াপত্তন হলো।'

এই যে জীবন ও সত্তার তাৎপর্যের কথা বলা হলো- জড় জগতের জড় সংসারে মানব জীবনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অনন্য অবস্থাকেই এক অমোঘ ইঙ্গিত করা হলো। মানব আত্মার অন্য অভিযান অন্য অভিযাত্রার কথা বর্ণিত হলো। এ যাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষ আবিষ্কার করতে থাকল তার নিজেকে। নিজেকে জানান এবং নিজেকে জগতে যথার্থভাবে উপযোগী করে তোলার নামই দর্শন। অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দর্শনের তীর্থযাত্রার এক অতি অভিজাত যাত্রী। দীর্ঘকাল এ পথে বিচরণ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন তিনি অসম্ভব সঙ্গত সংযমের মধ্য দিয়ে। জীবনের কাছে নিজেরই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি-

জীবন প্রভাতেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় ছিল আমার পূর্বের বাসস্থান? কোথায়ই বা আমি ফিরে যাব? আমার চারদিকে যেসব জন্তু রয়েছে ওরা আমার শত্রু না মিত্র? আমার সম্মুখে যেসব লোক মৃত্যু মুখে পতিত হলো ওরা কোথায় গেল? তারা আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?

মানুষ স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ স্বাপ্নিক। মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টিতে কিছু দেখে বলেই সে দার্শনিক, দ্রষ্টা। এ রকম দেখার শক্তি কেবল প্রাণিকুলের ভেতর মানুষেরই আছে। যে স্বপ্ন মানুষ দেখে সে স্বপ্ন চরিতার্থ করার শক্তিও মানুষের আছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ ভাবতে পারে। তাকে ভাবতে হয়। ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক যন্ত্রণার একটি অন্তঃস্রোত বয়ে যেতে থাকে মানুষের মানস নদীর ওপর দিয়ে। এ প্রবহমানতা তার জীবন অবধি সচল ও স্রোতস্বল থাকে। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক চৈতন্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবনের পথ পরিক্রমণ করতে হয়। এমন নয় যে, একটি ছাড়া অন্যটি চলবে। মানব জীবনের চালিকা শক্তি হচ্ছে 'জাগর চৈতন্য'। এই 'জাগর চৈতন্য'-ই তার ধর্ম। এই জাগর চৈতন্যের যখন মৃত্যু ঘটে তখন মানুষ হিসেবে তার মনুষ্যত্বের বিকাশধারায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকের বিপর্যয় তাকে বিধ্বস্ত করে যেতে থাকে ক্রমাগত। মানুষের বিশ্বাসের উৎস কোথায়? এ বিশ্বাস প্রতিটি আগামীকালের জন্য। যে আগামীর চিরন্ময় গর্ভে একটি ভবিষ্যতের জন্ম। শতাব্দীর মতো বয়সী এই মানুষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আগামীদিনের একটি শুভময় সমাজের আকাঙ্ক্ষায় এতদিন বেঁচে বর্তে ছিলেন। আমাদের ভেতর তাঁর জীবন দর্শনের সূক্ষ্ম বিন্দুটি একটি সমাজ বৃত্তের সম্পূরক স্পর্শক যেন। আমি অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রামপুরার বাসায় গিয়েছিলাম জীবনে একটিবারই মাত্র। তাঁর সঙ্গে এত দেখা হয়ে যেত যে, বাসায় যাওয়ার অতটা তাগিদ পেতাম না ভেতর থেকে। 'সভা-সমিতি, সেমিনার সিম্পোজিয়াম' এসব শব্দ যেন একাকার হয়ে মিশে থাকত আজরফ সাহেবের প্রাত্যহিকতায়। তিনি, এক কথায়, সমাজের 'অস্তিত্ব' হয়ে গিয়েছিলেন। সমাজের মানসভূমিতে তিনি বিচরণ করতেন। সমাজের সকল অবস্থানের মানুষের সঙ্গে তার এক গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। এ যেন

www.nagorikpathagar.org

বাংলারই এক শ্যামল-হরিৎ আত্মীয়তা। আজরফ ছিলেন এক বিশেষ অর্থে সমাজ মনস্ক মানুষ। তিনি ছুটে যেতেন সমাজের কাছে। সমাজের মানুষেরাও ছুটে আসত তার কাছে। এ সম্পর্কটা ছিল খুবই নিবিড় এবং নিরন্ধ্র। সহজ কথায় বলা যায়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমাজেরই অস্তিত্ব পুরুষ।

আমি যেদিন প্রথম তার রামপুরার বাসায় যাই সেও বহুদিন আগের কথা। এ রকম বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষটিকে ঐ ছোট্ট একটি বাড়ির কামরা কি করে ধরে রাখত, কিংবা তাকে অবস্থান দিয়েছিল, আমি বুঝে উঠতে পারি না সেটা মোটেও। একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত আঙিনায় একটি বনস্পতির আবির্ভাব, উদ্ভাস এবং বিকাশের মতো– তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে একথাটিই বলতে হয়।

অধ্যক্ষ আজরফ ছিলেন একজন দ্রষ্টা। তিনি দেখতে পারতেন। দেখতে পারতেন নিজেকে। পাশাপাশি অন্য আরও অনেককে। এই যে দেখার এক বিরল শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি এই শক্তিই ধীরে ধীরে তাঁকে করে তুলেছিলেন দ্রষ্টা থেকে একজন দার্শনিকে। তাঁর দর্শন মানুষের দর্শন। মনুষ্যত্বের দর্শন। জন্ম নিয়ে এসে কিছুকাল পৃথিবীতে থেকে গিয়ে আবার কোথায়ও হুট করে চলে যাওয়া-ই তো আর মানব জীবনের শেষ কথা নয়। এ ব্যাপারটি অধ্যক্ষ আজরফ ভালো করে জানতেন। সম্যকভাবে জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্য আছে এবং পূর্ণায়ত পরিণতিও আছে। অধ্যক্ষ আজরফ নিজেও এ শিক্ষা নিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ পরিসরের জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে। আবার তাঁর সমাজবাসীদের এ শিক্ষা নিয়ত দিয়ে যেতেন তিনি। কর্মময় জীবনের আস্থায় আস্থাশীল ছিলেন তিনি। তাঁকে বলা যায় কর্মষ্ঠ দার্শনিক পুরুষ। এ সমাজে যারা কর্তাগিরি করে বেড়ায় কাজের নামে তারা একেবারেই উদাসীন, অমনোযোগী। তাদের জন্য আজরফের কর্মময় জীবন এক অনুসরণীয় উদাহরণ। কর্তামি করে জগতে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু তার সঙ্গে জীবন যায় না কখন। জীবনের যাত্রা কর্মের সঙ্গে। কর্মহীনতার মধ্যে নয়। প্রায় শতাব্দীর মতো সমান বয়সী আজরফ তাঁর জীবনদর্শন অথবা মানবদর্শনে এ সত্যটিকে কেবল প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

সন্দেহ সন্দিগ্ধতার একটি সহজবোধ মানুষের মনে বিচরণ করে কিন্তু সারাজীবন মানুষকে এই সন্দেহের ভেতর কাটানোর কোনো অর্থই হয় না। শত্রুদের অন্তর্ভূমি

www.nagorikpathagar.org

থেকে বিশ্বাসের কথাগুলো যদি অঙ্কুরিত হতে না পারে তাহলে এই সন্দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু জীবনের সমস্ত অবস্থানে প্রবেশ করে জীবন নামক ভুবনটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

সংশয় পদ্ধতিকে বার্ট্রান্ড রাসেল গ্রহণ করেছিলেন দর্শনের মূল পদ্ধতি হিসেবে। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তের সঙ্গেও রাসেলের চিন্তার ঐক্য রয়েছে। রাসেল কথাটি স্বীকার করে এভাবে বলছেন-

"I think on the whole that the sort of method adopted by Descartes is right: That you should set to work to doubt things and retain only what you cannot doubt because of its clearness and distinctness."

[THE PHILOSOPHY OF LOGICAL ATOMISM-HONEIST 1918-19, PAGE 500]

মোটের ওপর আমি মনে করি যে, দেকার্ত যে ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সেটাই সঠিক কোনো বিষয়ে সন্দেহ করেই কাজ শুরু করা উচিত এবং সেটা তো স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে সন্দেহ করা যায় না, কেবল সেটাই গ্রহণ করা সমীচীন।

সন্দেহাতীত কাল ও সত্য বলে আমরা কি বুঝব। 'জগতে কি এমন কোনো জ্ঞান আছে, যা এত নিশ্চিত যে কোনো বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে না?

বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'The problems of philosophy' গ্রন্থে এ কথাটি বলেছেন,

"Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man could doubt it?"

দর্শনে সন্দেহাতীত হয়ে নিশ্চিত সত্যে পৌঁছানোই একমাত্র লক্ষ্য। এটা এমন সত্য, যা নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য। রাসেল মনে করতেন সংশয় পদ্ধতি দার্শনিক সত্যে পৌঁছানোর জন্য অপরিহার্য। আজরফের ব্যাপারটি একেবারেই ভিন্নমাত্রিক। নিছক সন্দেহে নয় বরং বিশ্বাসের অন্তহীন যাত্রার সত্যে পৌঁছানো সম্ভব। সেই বিশ্বাসের অপর আলোক ধারার সমুজ্জ্বল ব্রাত্যপথে পরিভ্রমণ করে অধ্যক্ষ আজরফ

www.nagorikpathagar.org

আজীবন সত্যের রাজতোরণের সন্ধানী ছিলেন। তাঁর এ অনুসন্ধিৎসা কখনো সম্ভব হয়েছে তাঁর নিজস্ব নিঃসঙ্গ বলয়ে। আবার কখনো কিঞ্চিৎ সংঘবদ্ধতায়।

আজরফের দর্শন চিন্তায় একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে একটি দ্রোহীসত্তার উদ্ভব ঘটে। তাঁর সত্য অন্বেষার সভাটি ক্রমাগত জাগ্রত হতে থাকে। হতে থাকে উপবিপ্লবী, বিদ্রোহী, জাগরী ব্যক্তির স্বাধীনতা 'আত্মার অমোঘ উদ্বোধন' এবং মানবকল্যাণ এই চিন্তার স্তবক তাঁর সমগ্র জীবনকে এক মহা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ও সমুত্থিত করেছিল। অধ্যক্ষ আজরফ আমাদের জাতীয় জীবন বলয়ের এক নক্ষত্র। তার কোনো প্রভায় দিনের আলোর মতো আলোকিত হতে পারব আমরা। তিনি যে মনুষ্যত্বের দীপশিখাটি জাগিয়ে রেখে গেলেন সেই আলোক প্রভায় আমরা আমাদের সঙ্কট ব্যক্তিতে এবং আস্তিত্বিক অক্ষয়ের নিয়ত জেগে উঠতে পারব। সঠিক দিশায়। সুস্থ মানসিক প্রবর্তনায়। সামাজিক হিতেষণায়। মানবতার তীর্থযাত্রার এ যাত্রিক আমাদের যুগযাত্রার যে শান্তি সম্ভাবনা ও মাত্রা দিয়ে গেলেন সেটা অবিসংবাদিত এবং অতুলনীয়। উদার মানবতাবাদী এ মানুষটি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, দাঢ্যতা, ঋজুতায় সর্বতিনন্দিত। এদেশে এ আদর্শ এ চারিত্র্য বিরলপ্রজ।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ এমনই এক মানবতাবাদী মানুষ ছিলেন যিনি জাতির উর্ধ্বে রাষ্ট্রের উর্ধ্বে সর্বজনীন চিন্ময় আত্মার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জীবনের মার্জিত ভাষা এবং দার্শনিকতার সমন্বিত শব্দবিন্যাসে একটি মানবিক সমাজের রূপরেখা রচনা করে গেলেন। যে সমাজটাকে বিষয়ে প্রকরণে ও প্রবর্তনায় উদার নিবিড় বিনয়ী এবং সনির্বন্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান মানব সমাজের মুক্তির জন্য অনবদ্য জীবন দর্শন রচনা করে রেখে গেলেন আজরফ।

আমরা এখনো জেনেও যেন না জানার ভান করছি আমাদের সমাজে আজরফের মতো এমন ক্ষণজন্মা একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমরা যে কোন সমাজের মানুষ? কোন ধাতু দিয়ে গড়া আমাদের স্বভাবের সত্তাটি আমি বুঝে উঠতে পারি না। বাংলাদেশের মাত্র একটি-দু'টি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সবই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (STATE-INSTITUTION) পর্যন্ত কেমন নির্বাক, নিঃশব্দ নিরপেক্ষ উদাসীন রয়ে গেল এই মহান যুগ মানুষটির প্রতি, যা ভাবতে অবাক লাগে আমার।

www.nagorikpathagar.org

এ নামের কোনো মানুষই যেন ছিলেন না আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, কুত্রাপি। ধিক, এ অধঃপতিত স্বার্থ-প্রপীড়িত সমাজ মানস। ধিক সময়ের ক্ষুদ্রমনস্কতা।

যে সমাজ সূর্যের আলোর ছায়ায় বসবাস করেও, সূর্যের আলোক ঐশ্বর্য ও অবদান স্বীকার করে না সে সমাজের আলোর প্রত্যাশাও হয়তো একদিন ক্ষীয়মান ও স্থবির হয়ে পড়ে। আলো পেয়েও আলোরতি বৈরিতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কোনো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। এ নির্বোধ বৈরিতায় সূর্যের তো কোনো ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই। মানুষের সভ্যতা ও প্রগতির স্বার্থে আজরফ জীবন-দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি-সমন্বিত যে গ্রন্থাবলি রচনা করে রেখে গেছেন সে থেকে এ সমাজের সচেতন মানুষ মানবিক ঐশ্বর্যময় এক আলোকিত পৃথিবীর সন্ধান পাবে, এ বিশ্বাস আমার অটুট।

অধ্যক্ষ আজরফ দর্শনকে জীবনের সঙ্গে জগতের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। দর্শন কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। যে 'জড়সমাজ' মানুষের যথার্থ সত্তা সম্বন্ধে সন্ধান করতে দেয় না- সেই জড়সমাজের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিরোধ তেমনভাবে কখনো গড়ে ওঠেনি। মননচর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে এক উদার ও মার্জিত, শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মাধ্যমে তিনি সামাজের পরিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর চেয়েছেন। অকাল অচেতন সমাজ কর্ণধারদের দ্বারা পরিচালিত এ জড়সমাজের যথার্থ মুক্তি ও বন্ধন মোচন করতে প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তাঁর সারাজীবনের সাধনাই ছিল এ জড়সমাজের অচলবস্থা দূর করা। জড়সমাজের কর্তারা জানেন না- এ সমাজের যৌক্তিক পরিণতি কি এবং কোথায়? মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি? এসব কিছুই চিন্তার অধিগম্য বিষয় নয় তাদের। জীবনের সঙ্গে সমাজের, মানব সত্তার সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক এই মৌলিক জীবনাধা খুঁজে বের করে এনে এর একটা সুন্দর সমন্বয় ঘটানোর জ্ঞান অর্জন করা যায় না। গেলে- মানবজীবনের কোনো সার্থকতাই অর্জন করা যায় না। এই সত্যটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ আজরফ আলোক দান করে গেছেন আমাদের। মানবসংস্কৃতির প্রধান হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ ঘটানো। এই পরম জ্ঞান ও সত্য আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য আমরা সম্পাদন করতে পারি বর্তমান মানব জীবনেই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্তা হয়ে মানুষ তার সমস্ত সমস্যার

www.nagorikpathagar.org

সমাধান করতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের অধিকারী হতে পারে। 'মানব শারীর কাঠামো' হচ্ছে এক অপূর্ব গতিশীল, জীবন্ত যন্ত্র। এই মানব শারীরকে অবলম্বন করে আমরা 'নিত্য' প্রাপ্ত হয়েছি। সংসার-সমুদ্র পাড়ি দেয়ার এ এক অত্যন্ত সুন্দর শকট। অত্যন্ত দুর্লভ এক তরণী। কি করে এ তরণীতে পাড়ি জমাব আমরা? আমাদের কাণ্ডারি কোথায়? পারানির কড়ি আছে, পাঞ্জেরি কোথায়? প্রতিটি মানুষই তো এক একজন জীবন নাবিক। নাবিকী সওদাগরি সহজ সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষেরই নিজের হাতে ন্যস্ত। কখনো বৈরী হাওয়ায়, কখনো অনুকূলে এই জীবনতরি ভেসে চলে। কাণ্ডারিকে হাল ধরতে হয় শক্ত হাতে, সাবধানে। মাস্তল সোজা করে দাঁড় করাতে হয়। তারপর কপিকল দ্বারা পাল খাটাতে হয়-আকাশ, আবহাওয়া দিগন্তের দিকে লক্ষ রেখে। সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে আমাদের সবাইকে সফলভাবে, সার্থকভাবে এ থেকে কারুরই নিস্তার নেই। সাগরে জীবন জাহাজটি সঠিকভাবে ভেসে না চললে ভরাডুবি হবে সাগরের অতলগর্ভে। দুঃখময় পরিণতি হবে তখন জীবনের। এই তো জীবন দর্শনের কথা। এই তত্ত্বটিই শিক্ষা দিয়েছেন আজরফ তাঁর পরিপার্শ্বের সমাজের মানুষকে। পারমার্থিক কালের আলোকের অভাব দেখে আজরফ বারবার তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অন্ধকারের দানবদের ভ্রুকুটি দেখে তিনি শিহরিত হয়েছেন। মানবজীবনের সভাস্বরূপের জ্ঞানকে জ্ঞানের সারাতিসার চিন্তা করা যায়। জড়জগতের ভেতরে মানুষের সৃষ্টি উদ্ভব বিকাশ। তাই বলে মানুষ জড় বস্তু নয় কোনো। জড়জগতের বাসিন্দা সে। জড়জগতের ভেতর উদাসীন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মানুষ নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে না। চরম উদ্দেশ্যটি পরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্তর্লীন করতে পারে সে। সৃষ্টির আদি ও অতীত উদ্দেশ্যও এটাই।

অধ্যক্ষ আজরফ এদেশের এবং উপমহাদেশের প্রবীণতম দার্শনিক শিক্ষাবিদ সুপণ্ডিত সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচক এবং সুসাহিত্যিক। মাত্র ক'দিন আগে তিনি আমাদের ধূলি ধূসর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন আরেক পৃথিবীর দিকে। সংসারের উঠোনোর আলো বাতাস ফেলে রেখে চলে গেলেন অন্য এক অনন্তের শাশ্বতের মহা পৃথিবীতে। যেখানে মানব মাত্রই একাকী এবং নিঃসঙ্গ। সেখানে সাথী কেবল নিঃশব্দ মৃত্তিকাপুঞ্জ সেখানে আর কারোর কোনো ডাক, মায়ার

www.nagorikpathagar.org

আহ্বান আবেগ তাঁকে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ স্পর্শ করবে না ইন্দ্রিয়ের আহ্বান। অতীন্দ্রিয় এক শব্দহীন, স্পর্শহীন, আলোহীন, অন্ধকারহীন, এক অনন্যপূর্ব ভুবনের বাসিন্দা এখন তিনি। তাঁর বিদেহী আত্মা এখন অনন্তের শান্তি কল্যাণ এবং মুক্তির দ্বারপ্রান্তে শায়িত। আমরা প্রার্থনা করব তাঁর জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁর বিদেহী আত্মার পারলোকিক শান্তি কল্যাণ, মঙ্গল এবং মহাপরিত্রাণের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

নূরুল মোমেনের নেমেসিস

ষোলই ফেব্রুয়ারি। উনিশ শ' সাতানব্বই সাল।
আজ নাট্যগুরু নূরুল মোমেনের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী।

এ উপলক্ষে আমার ওপর লেখার তাগিদ এলো। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ফয়সাল মাহমুদ আমার রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাসকক্ষে এসে হাজির। আমিও রাজি হয়ে গেলাম অকুণ্ঠ চিত্তে, কিছু লিখতে। তাঁকে স্মরণ করতে। নূরুল মোমেন মানে আমাদের বাংলা সাহিত্যের নাট্য দিগন্তের এক ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। বিশ্ব ব্যক্তিত্ব।

আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রবণতা খুবই লক্ষ করার মতো। ব্যাপারটি সত্য হলেও মর্মান্তিক বটে। আমরা ছোটকে জোর করে বড় করে তুলতে প্রয়াস করি আর বড়কে ছোট জ্ঞান করার হীনমন্যতা পোষণ করি। এ তোষণ ও পোষণ যুগপৎ দুই-ই দোষণীয়। এটা বুঝেও যেন না বোঝার ভান করি। ভানটা যে কতখানি আত্মঘাতী ও মারাত্মক সেটা কখনো উপলব্ধি করতে একটুও প্রয়াস পাই না। এ প্রয়াস পাওয়াটা খুবই অনিবার্য প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

নাট্যগুরু নূরুল মোমেনের মৃত্যুবার্ষিকীতে উপরোক্ত কথাক'টা বললাম। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে এ কথাক'টা অত্যন্ত সামান্য হলেও এর যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে। নূরুল মোমেন যে আমাদের নাট্যভুবনের প্রথম আধুনিক স্থপতি পুরুষ এ কথাটা যেন কখনো কোনোভাবে বিস্মৃত না হয়ে পড়ি। জাতির কালবেলায় এ বিস্মৃতি বিষদ্রব্যের মতো মিথষ্ক্রিয়ার সূত্রপাত করে। বিষক্রিয়া ঘটিয়ে যায় ক্রমাগত। আর নাট্যগুরু নূরুল মোমেন আমাদের ভেতরে সশরীরে উপস্থিত হন। কিন্তু স্ব-পতিভা স্ব-অস্তিত্বে সচকিত ও দুদীপ্ত করে রেখেছেন আমাদের স্মৃতিকে। আমরা শ্রদ্ধায় এ স্মৃতির ভার বহন করে যাব। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। যুগ যুগ কাল।

"A theatre is a society within society"

[Theatre of Commitment. E. Benty (p-140) 1968]

সমাজের ভেতর আরও একটি সমাজ রয়ে গেছে। নাটক সেই সমাজটাকে সমাজের খনিগহ্বর খুঁজে খুঁজে তুলে আনে। এ খনন প্রক্রিয়া চলতে থাকে নাট্যসংলাপের সূচনা পর্ব থেকে সংলাপের শেষ শব্দটি পর্যন্ত। আসলে একজন নাট্যশিল্পী তার

www.nagorikpathagar.org

সমাজের চার পাশের যন্ত্রণা, অস্থিরতা, আততি ও আর্তনাদ অভিপ্রেরণা এবং স্বপ্নকে নাটকের ভেতর জাগিয়ে তোলেন। নাটক তো সমাজ চিত্রের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। দর্পণের সামনে আরেক প্রতিদর্পণ।

> "Of all the arts, drama, both in method and effect can the most exemplary."
>
> [The study of Drama. H. G. Barker CP-58, Folcraft Lib. 1972.]

নূরুল মোমেনের 'নেমেসিসে' স্ব-সমাজের প্রতিচ্ছবি যেমন প্রতিভাত দেখি, ঠিক তেমনি বিশ্বসমাজ মানবের ভ্রান্তি, মূঢ়তা, কপটতা ও ভণ্ডামিকেও পরিলক্ষিত হতে দেখি। এ যেন বিশ্ববীক্ষণের এক সার্থক প্রতিবিম্ব।

নূরুল মোমেনের নেমেসিসে ভাষা ও সংলাপ প্রসঙ্গে এখানে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ল্যাজোস এগরির উক্তি স্মরণ করব।

> "Good dialogue is the product of character carefully chosen and permitted to grow dialectically, until the slowly rising conflict has proved the premise."
>
> [The Art of Dramatic writing, New york, 1963. p. 245.]

নূরুল মোমেন নাটকে যে সংলাপ প্রয়োগ করেছেন, সেটা নিঃসন্দেহে এক সুদক্ষ নাট্যকারের সৃষ্ট সংলাপ। 'কারণ সংলাপই নাটকের সাফল্যের প্রয়োজনীয়তম চাবিকাঠি। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের ওপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হতে থাকে। আর পরে সেগুলোর মূলে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করে।' ক্রমাগত নাট্যিক দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করে তোলে। তবে নাটকে অতি সংলাপ নাটকের প্রাণকেও সংহার করতে পারে। খধমড়ং ঊমৎর নাটকে সংলাপ বাহুল্যের প্রতি সতর্ক উক্তি করে বলছেন।

"Do not over emphasize dialogue, Remember that it is the medium of the play but not greater than whole."

[Ibid. p. 244]

রম্যাঁ রঁল্যা বলেছেন : "It is not the purpose of art to reconcile and to

www.nagorikpathagar.org

pacify but to intensify life, render it stronger and better."

[The people theater Romand Rolland, edited by Shudhi Pradhan. (p. 98-99) First edition.]

শিল্পের অপর নাম বিকাশ, বিভাস, বিস্তার। শিল্পী কখনো নিজেকে সংগোপন সংক্ষেপণ সংকোচন করে রাখতে পারে না। তিনি একককে বহুর ভেতর সংস্থাপন করেন- বহুর ভেতর দেখেন তার নিজের উদ্ভাসন, বিপুল বিস্তার। মানুষ সে নিজেকে সংগুপ্ত রেখে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারে না। তার আনন্দ জীবনের সশব্দতায়, তীব্রতায়। ...নাটকে তাই এই ভাবের বিকাশ, সম্বোধির সংপ্রকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ-ই সব থেকে অনিবার্য হয়ে পড়ে। নাটকে এই বৈচিত্র্যকে উদ্ভাসিত করার জন্য বিভিন্ন কলার সমবেত মিশ্রণের এক যোগ রসায়ন ঘটান নাট্যকার। সেই যোগ রসায়নে আমরা লক্ষ করে থাকি সংঘবদ্ধতার সমন্বয়ের সুর। এ স্বর-সম্মিতিতে সঙ্গীত, সংলাপ, নৃত্য, অঙ্গভঙ্গির নানা প্রসাদ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানেই নাট্যকলার নন্দন গ্রাহ্যতা এবং চিরায়ত ঘরানার 'গর্ভগৃহ'। নূরুল মোমেনের জন্ম ১৯০৬ সালে, ২৫ শে নভেম্বর। আর তিনি পরলোকগমন করেন ১৯৯০-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নেমেসিস'। সাড়াজাগানো দেশবিশ্রুত এ নাটকের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য হলো-একক চরিত্র এবং একটি মাত্র দৃশ্যে বিন্যস্ত এবং পরিকল্পিত। নাট্যকার নিজেই 'নেমেসিসের' পূর্বাভাসে বলেছেন :

"এই নাটকটিতে গ্রিক ট্র্যাজেডির চিরাচরিত সময়, স্থান ও ক্রিয়া-এই ঐক্যত্রয়ের আঙ্গিক ঠিক রেখে চতুর্থ ঐক্য অর্থাৎ চরিত্রের একত্ব (Unity of Person) সংযোগ করে একটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এই এক অংকের নাটকটিকে এক চরিত্র-সর্বস্ব করা সত্ত্বেও ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের পাঁচ অংকের ক্রম-পরিণতির ছকে ফেলে লেখার আঙ্গিক এটাতে লক্ষ করা হয়তো কঠিন হবে না।"

পৃথিবীর চারজন বিখ্যাত নাট্যকার এক-চরিত্র নাটিকা লেখার প্রচেষ্টা করেছেন। স্ট্রীন্ডবার্গ করেছেন 'দি স্ট্রংগার'-এ। ও' নীল 'দি ব্রেকফাস্ট'- এ ককতু করেছেন, 'দি হিউম্যান ভয়েস'-এ (La voix Humaine)-এ আর রবীন্দ্রনাথ করেছেন, 'বিনি পয়সার ভোজ'-এ।

ককতু'র নাটকটি ছাড়া উপর্যুক্ত নাটিকাগুলো সবই প্রায় পনের কুড়ি মিনিটের। ককতু'র নাটকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও পূর্ণাঙ্গ নাটক

www.nagorikpathagar.org

বলতে যা বোঝায় এটা তা কি না সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ। নেমেসিসের 'নির্মিতি-নিরিখ' কিংবা স্ট্রাকচার পর্যালোচনা করলে আমরা নাট্যকারের এ উক্তির যথার্থতা দেখতে পারব। আমরা ক্রিস্টোফার মার্লোর (Christopher Marlore) 'ডক্টর ফস্টাস' যেমন তার নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল সুরঞ্জিত নন্দীও তেমনি তার আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছিল নৃপেন বোস ও তার সহযোগী অসীমের কাছে। ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত, মৃত্যু পথযাত্রী সুরঞ্জিত নন্দীর আর্তচিৎকারে যেন ডক্টর ফস্টাসের আর্তচিৎকারেরই অনুরণন। ডক্টর ফস্টাসের আত্ম-আততির গভীরতার চেয়েও নূরুল মোমেনের 'নেমেসিসে' আত্ম-উৎকীর্ণ যন্ত্রণার গভীরতা সময় ও সমাজের নিরিখে অধিকতর কালজ এবং একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণ। এ কালোত্তীর্ণতার দাবি নূরুল মোমেনের স্ব-প্রতিভা ও স্ব-শক্তির পরিচয় বহন করে। সুরঞ্জিত নন্দীর আত্মার 'স্ব-উক্তির' চিত্রটি কি? সেটা তো যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষদীর্ণ বাংলাদেশেরই চিত্র। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, আমরা দেখব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রজনিত চরিত্রেরাই হচ্ছে এই সুরঞ্জিত নন্দী নৃপেন বোস এবং অসীমেরা।

পৃথিবীতে এ বিশ্বমানব সংসারে এমনি অসংখ্য ন্যায়নিষ্ঠ অসীম 'নেমেসিসের অসীমে পরিণত হয়েছে। সুরঞ্জিত নন্দীকে লক্ষ করে নৃপেন বোসেরা এভাবেই বলতে প্রয়াস পায়।

"...বিবেকটাকে সাপের খোলসের মতো ত্যাগ করে নতুন হয়ে বেরিয়ে এসো। সময়ে আবার খোলস পরবে। এ বর্ণচোরার দেশে মহারথিদের শামিল হওয়ার ঐ একই পন্থা।"

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : "নেমেসিস নাটকটির প্রতিটি সংলাপের মধ্যে নাট্যকারের তীক্ষ্ণ 'ধীরশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান ও প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেন,

"সজাগ অনুভূতি, সূতীক্ষ্ণ রসবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের ব্যঞ্জনায়, ঘটনার অনিবার্যতায় এবং উপস্থাপনায় 'নেমেসিস' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।" এটা আজ বিজ্ঞজন ও সর্বজন স্বীকৃত যে, নেমেসিস বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি অনন্য ও অনবদ্য সৃষ্টি। স্থান, কাল ও দেশের সীমা পেরিয়ে নেমেসিস কালোত্তীর্ণ অভিধায় অভিষিক্ত। নূরুল মোমেন আজ তর্কাতীতভাবে আমাদের আধুনিক নাট্যসাহিত্যের পুরোধা পুরুষ। নাটক তো জীবনেরই দর্পণ। জীবনের সঙ্গে জীবনের ভাষা যুক্ত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

নাটক সৃষ্টি করেন একজন নাট্যকার। বাঙালি নাট্যকারগণ প্রথম যুগ থেকেই এটা বুঝেছিলেন যে এটিকে জীবনের স্বাভাবিক সাধারণ 'কাস্টম্যরি' (customary) ভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা তারা করেও আসছেন। এছাড়া বাংলা নাটকে 'চলিত নাট্যসংলাপ' গদ্যের মূলে প্রধানত যে উপাদানগুলো শক্তি যুগিয়ে আসছে এর মধ্যে বিদেশি শব্দপুঞ্জের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এ দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্যে প্রায় পাঁচ বছর ফার্সি ভাষা প্রচলিত ছিল। এর ফলে হাজার হাজার আরবি ফার্সি শব্দ এসে মিশে গেছে আমাদের বাঙালি জীবনধারায় এবং বাংলা ভাষার সার্বিক অস্তিত্বে। তুর্কি, উর্দু, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি ভাষার শব্দগুলোও উনিশ শতকের লেখা ও কথ্য ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। প্রধানত বাংলা নাটকেই গদ্যে সংলাপের শরীরজুড়ে এই শব্দরাজির অনুরণন শোনা যায় হরহামেশা। আমরা জানি, বাংলা নাটকে এসব শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ এসব শব্দ আপামর মানুষের প্রতিদিনের শব্দ হয়ে ওঠে। লোকায়ত ভাষার রূপ পায়। নাট্যসংলাপে এই গদ্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্য বাঙালি নাট্যকারগণ এসব শব্দের সার্থক ব্যবহারই করেছেন। নূরুল মোমেনের নাট্যসংলাপের স্বভাবধর্মে এটাও সত্য হয়ে উঠেছে। নাটকের ভাষা গদ্য হলে জীবনের স্বাভাবিক সমান্তর প্রান্তরগুলোর উঁচু-নিচু সব রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবন্ত হয়ে ওঠে আরও বেশি মাত্রায়। ...নাটকে প্রথম পঞ্চাশ বছরের পদ্য সংলাপের পাশাপাশি গদ্যসংলাপ এগিয়ে চলে এবং শেষে গদ্যসংলাপই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকর এ প্রসঙ্গে বলেছেন "প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে আমি ব্ল্যাকভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলাম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের। কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়। অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, সমতল, অসমতল প্রান্তর, কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।" কাহিনীর বিস্তারে চরিত্রের বিন্যাসে এবং নাট্যকে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ও অস্থিরতার আর্তনাদ নির্মাণে গদ্যসংলাপই সময় ও কাল নির্ভর বেশি এবং স্থায়িত্বের দাবি রাখে। নূরুল মোমেনের নাট্যসংলাপের সেই গদ্যভাষার যথারীতি উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং তার 'নেমেসিসের' নাট্য সংলাপ সে কৃতিত্ব ও শক্তির দাবিদার।

নূরুল মোমেন ছিলেন সব্যসাচী ব্যক্তিত্বের পুরুষ। তিনি একাধারে ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, নাট্যকার, কুশলী অনুবাদক কমেডি ও ট্র্যাজেডির

www.nagorikpathagar.org

সার্থক রূপকার 'উইট' ও 'হিউমার' সৃষ্টির নিপুণ কারিগর' কৃতী অধ্যাপক এবং বৈঠকী কথার রসজ্ঞ মানুষ। তিনি হাসতে জানতেন, হাসতে পারতেন। অন্যদেরও হাসাতে পারতেন অবলীলাক্রমে। এতে তাঁর জুরি মেলা ভার। সংবাদপত্র জগতের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অকুতোভয় কলামিস্ট হিসেবেও তাঁর পরিচিতির ব্যাপ্তি একটুও কম নয়। চল্লিশ দশকের শেষদিকে তিনি বিবিসি'র 'কাকলি' অনুষ্ঠানটি 'দাদাভাই' হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তাঁর উপস্থাপনার ভাষা ও 'ডিক্‌শানটি' ছিল একেবারেই 'জুভিনাইল'।

নাট্যগুরু নূরুল মোমেন মানুষ হিসেবেও ছিলেন অনেক বড়। তিনি এক স্বকীয় ব্যক্তিত্বের মহিমায় জীবনধারায় রচনা করতে পেরেছিলেন এক স্ব-বিভাসিত মহত্তর অবস্থান। সে ভুবনের এক নিবিষ্ট বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারের ঐতিহ্য, স্বকীয়তা, সত্যচিন্তা, ন্যায়বোধ তাঁকে গড়ে তুলেছিল আত্মপ্রত্যয়ী করে। আপোষহীন, সত্যনিষ্ঠ এই মানুষটি জীবন ঘষে আগুন বের করে এনেছেন আজীবন। আর মৃৎশিল্পীর মতো কাদামাটি দু'হাতে ছেনে আগুনের শিখায় পুড়িয়ে এ মাটির দেহটাকে দাহ্য করে একটি খাঁটি মৃৎশিল্পই যেন রচনা করে গেলেন হাসতে হাসতে।

www.nagorikpathagar.org

হাসান হাফিজুর রহমান : স্বভূমে স্বদেশে

তিনি আধুনিক বাংলা কবিতা ও বাঙালি জাতির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিলেন এক নয়া কক্ষপথের ইঙ্গিত। বাংলা ভাষা এবং ভাষার সংগ্রামের কথা উঠলেই হাসান হাফিজুর রহমানের নাম এসে যায়। এক অনিবার্য সত্য। হাসান তার জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সংগ্রামের মধ্যে। জীবনের অতল খনির ভেতর থেকে তুলে এনেছিলেন স্বপ্নের মণিমুক্তাগুলো। আর মহাসিন্ধু থেকে পান করেছেন 'সত্যাসবের' মৃৎপাত্র ভরে। তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন এক স্বপ্নীল আবহ রাজ্যে। সারাজীবন সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে অস্তিত্বের জয়গান করেছেন তিনি। সমাজ, মনুষ্যত্ববাদ, স্বাধীনতা এসবই ছিল তার জীবনের অধীত বিষয়। মূলত, হাসান একুশের রক্ত-মর্মর দিয়ে নির্মাণ করেছেন তাঁর জীবনের ইমারত। সে ইস্পাত পাথর রক্তিম এবং রুধিরাভ। হাসানের জীবনের ঝর্ণাতলা দিয়ে কেবল বয়ে গেছে রক্তরাতুল স্রোতধারা। হাসানের বুকের ভেতর, বোধে মর্মে ছিল মহান একুশ-হাসান একুশের বনেদি রাজমিস্ত্রি। একুশের হর্ম্যরাজির রাজসিক স্থপতি। বায়ান্নোর একুশের দিনটি থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত অব্দি হাসান ছিলেন নিজভাষা-মাতৃভাষার প্রতি নিবেদিত, উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হাসান বিশ্বাস করতেন জীবনের অন্তস্থল থেকে যে অস্তিত্বের সুরধ্বনি বেজে ওঠে সে সুরতন্ত্রী আমাদের ভাষার মর্মমূল থেকেই ধ্বনিত, বঞ্চিত। হাসান বাংলা ভাষার সে বহুবর্ণ, শাশ্বত সত্তার শরীরে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। দেহে ও আত্মায়, স্বপ্নে ও সংগ্রামে জীবনে ও ভালোবাসায় অন্তর্লীন হয়ে পড়েছিল সে ভাষা।

হাসান বাঙালি জাতির চেতনা ও মননকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন স্বভূমে, স্বদেশের মাতৃনাভিতে। তাঁর সে প্রয়াস সার্থকও হয়েছে অনেকাংশে। যুগে যুগে, কালে কালে তাঁর ভেতরকার আরও স্বপ্ন ও এষণা অঙ্কুরিত হবে, সঞ্চারিত হবে। হাসান হাফিজুর রহমান বেঁচেছিলেন মাত্র ৫১ বছর। আমাদের সংসারের রৌদ্রজ্জ্বল ধূসর উঠানোর মায়া কাটিয়ে হাসান চলে গেছেন অজানা আরেক লোকে আনন্দলোকে মঙ্গললোকে। তিনি আর কখনো আমাদের সংসারের চত্বরে সশরীরে ফিরে আসবেন না। কিন্তু তিনি বার বার ফিরে আসেন আমাদের মানসে, মননে। হাসান ছিলেন আদর্শসিক্ত,

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর এক প্রাণবান পুরুষ। তিনিও জয় করে নিতে পেরেছেন জাতির কোমল কমলকুসুম হৃদয়বৃন্ত। হাসানের অকাল মৃত্যুতে আমরা কেঁদেছিলাম, দেশবাসীর সাথে। মানবজীবনের সার্থকতা তার দীর্ঘ আয়ুষ্কালের পরিধিতে নয় বরং কর্মের ব্যাপ্তি ও বিশালতায় মানবজীবনের সার্থকতা নির্দিষ্ট হয়। হাসান জীবনের সে মহত্তর চিহ্নগুলো আমাদের চোখের সামনে রেখে গেছেন। হাসান পরলোকে চলে গিয়ে কি সব কাজ গুটিয়ে রেখে গেছেন? না তা নয়। তাঁর আরব্ধ, অসমাপ্ত কাজগুলো আমাদের চেতনার এ প্রান্তে, ও প্রান্তে বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আমরা কখনো যেন সেটা বিস্মৃত না হই। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আঁধার নেমে এলে, কুজ্ঝটিকায় ঢেকে গেলে আমাদের চেতনার প্রান্তরে নৈরাজ্যের কালো ছায়া নেমে এলে আমরা হাসানের পঙ্‌ক্তিমালার শরণ নেব। শব্দ করে উচ্চরণ করব :

"আমরা উৎস, ভাষার আশার
ঝর্ণা গড়াই প্রতিনিয়ত :
ভীরু সবুজের মখমলে দিন
চির স্বভাবেই অব্যাহত
তাকে খুব জানি, তার রোশনাই
তবু নয় জানি প্রিয়ার মতো
জাগ্রত রোগে বাঁচি না বাঁচাই
-সন্তাপে দেশ মর্মাহত।

মগ্ন ব্যথায় কাহিনী শোনাই
জীবনের ঋণ আঁধার বিপুল রাত তামসী
তবুও উৎস এই আমরাই ভাষার আশার
গড়ি ইমারত, স্বজনে সবাই দীর্ণ স্বপ্নে
কথামালা দীপে জ্বালাই হাসি।

ভাষা আছে তাই সংলাপ গেঁথে সখ্যে বাঁচি;
-বাঁচি না বাঁচাই, একে অপরের আঁধার পোড়াই;
প্রাণের কথার অশেষ আশার

www.nagorikpathagar.org

হৃত যৌবন অস্থির এই দগ্ধ দিনে
উদ্ধত এই মৃত্যুকে হেনে
শেষ প্রহরেও আমরা আছি।"

আমার উৎস : বিমুখ প্রান্তর/পৃ: ১৯
[হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলি]

হাসানের কবিতায় শ্রেয়বোধ, স্বদেশ, সমাজবোধ, মনুষ্যত্ববোধ সবসময়ই জাগর, উন্মুক্ত ও উচ্চকিত। তাঁর অস্তিত্বে স্বদেশের প্রকৃতি নিসর্গ, হরিৎ-তিমির উদ্ভিদ, গুল্মলতা। লোকায়ত জীবন প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান বার বার তিনি। কঠিন বাস্তব থেকে সেঁকে তোলেন জীবনের রস, বিষিক্ত সুধা। হাসানের বহিঃমানুষের সঙ্গে অন্তঃমানুষের, তার কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বিভেদ নেই, বৈষম্য নেই। বরং সর্বাংশে একীভূত, এককেন্দ্রিক। সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁর অন্তহীন। একার জন্য নয়-অনেকের জন্য তিনি অস্থির, বিপুলভাবে একাত্ম হাসানের হাতে আধুনিক রুচি ও প্রগতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি যেন যুগ-নিয়ামকের শক্তির মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন-পঞ্চাশ দশকের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নির্মাণের কালপর্বে।

পঞ্চাশের দশকে আমাদের যে ক'জন কবি বিপুল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন হাসান হাফিজুর রহমান তাদের অন্যতম, এ কথা বলাই বাহুল্য। হাসানের শিল্পীসত্তা ছিল বাস্তবের ধূসর মৃত্তিকায় আকীর্ণ। "কবির মানসলোক প্রাথমিকভাবে নিরবয়ব স্মৃতি কল্পনা-বাসনা-বিহারী অদৃশ্য ভাবসূত্রে গ্রথিত প্রতীয়মান হলেও এ সত্য স্বীকার্য, বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায় তার শিকড় অনুঃপ্রবিষ্ট। কারণ যে প্রাতিস্বিক এবং মনোজাগতিক অভিনিবেশ, প্রবণতা ও আবেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ অভিঘাতে কবিমানস নিয়ন্ত্রিত, তার উৎস বহিঃবাস্তবের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট।"

[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্যের মুক্তি, স্বগত, পৃ: ৩০]

তিনি আরও বলেছেন, "মূলত বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবের যুগ্ম অভিজ্ঞতায় পরিশ্রুত হয়ে সৃজনক্রিয়া রূপ পরিগ্রহণ করে।" আমরা দেখব, একজন কবির ব্যক্তিসত্তা তার শিল্পী সত্তার প্রধানতম আধার। ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ় নির্যাস থেকেই শিল্পীসত্তার উদ্ভাসন ও উৎসারণ। এ কথা সকলকেই মেনে নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

"একজন কবির শিল্পসত্তা তাঁর ব্যক্তিসত্তা নিরপেক্ষ হতে পারে না। শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা অবিভাজ্য, একসূত্রিক-একের পলিসঞ্চয়ে অন্যের ভূমিতল নির্মিত। ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বিচিত্র মানুষ ঘটনাপুঞ্জ ও চেতনা স্রোতের যে সম্পর্ক, সংঘাত ও সমন্বয় তার সূক্ষ্ম জটিল উনাজালে কবি প্রতিভার গ্রন্থনা।"

[মুখবন্ধ, সংবর্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ১৭২]

আমরা বলেছি, হাসানের বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকা তো তাঁর স্বভূমি, স্বদেশ। ওখানেই তাঁর প্রেম ও সংগ্রামের শেকড় প্রোথিত ছিল। তাঁর শরীর সত্তার শোণিত ও মৃত্তিকা পললে নির্মিত হয়েছিল 'স্বপ্নভূমিতল'। তাঁর চেতনা স্রোতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল মৃত্তিকাপলল প্রবাহ। হাসান তাঁর স্বপ্ন ও ভালোবাসা ও সংগ্রামকে ব্যক্তিসত্তা থেকে প্রকৃতিসত্তা, প্রকৃতিসত্তা থেকে স্বদেশ সত্তায় সংস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। হাসানের কবিতায় স্বভূমি স্বদেশের আবহমান অস্তিত্বের এক চিত্রকল্প বিধৃত হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান বলেন, "আমরা এ পৃথিবীতে নিঃশেষ হই, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় প্রকৃতিকে নিঃশেষ হতে দেখি না। বিরাট বটবৃক্ষ প্রবহমান নদী, প্রচণ্ড ঝড় এবং সর্বপ্রকার জীর্ণতা নিয়ে উপস্থিত নদীতট, এগুলো আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের দৃষ্টির সীমায় সব সময় থাকে। হাসান তার কবিতায় প্রকৃতির এই শাশ্বত ব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।" হাসানের কবিতায় সে স্বদেশ প্রকৃতি উদ্ভাসিত।

"দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার
নদীমালা গাছপালা প্রশান্ত খামার
বৈশাখের ঘূর্ণিবায়ু আষাঢ়ের ঢল
মুগ্ধ পটে ফুটে ওঠে বিস্মিত উজ্জ্বল

কাদামাখা চাষাভুষো মেহনতি হাত
অর্পিত দেহের ভার রাখে পলিত্বকে
নির্বিশেষ স্তন দাও ক্ষুধার পাবকে
অক্লান্ত উৎস তুমি প্রাণের প্রপাত

তোমার মর্তের ওই অমর্ত রোশনাই

www.nagorikpathagar.org

মতের অবোধ ভোজে দুহাতে ছড়াই
দুহাতে আঁজলা ভরি তোমাকেই পাই
জঠরের অন্ধ যেন ঋণ শুধে সাধ।"
[স্বদেশ আমার/বিমুখ প্রান্তর : পৃঃ ১৭
হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলি, প্রথম খণ্ড]

হাসান তাঁর হৃৎপিণ্ড খনন করে করে স্বদেশের অস্তিত্ব নির্মাণ করেন। এ যেন পাথর কেটে কেটে খুঁদে তোলা অমর অজর মাতৃমূর্তি দেশমাতৃকা।

"আমার হৃৎপিণ্ডকে আমি উপড়িয়ে আনতে পারিনে
কিন্তু পারি সমগ্র অস্তিত্বকে সমর্পণ করতে
আমার সত্তাকে আমি পারিনে দেখাতে
কিন্তু পারি আমার আশা বাসনার
রঞ্জিত ফুল স্পন্দিত ধ্বনিতে ফোটাতে
আমার দেহের শিরা-উপশিরাকে আমি জানিনে
কিন্তু জানি আমার দেহকে-
ব্যথা আনন্দ সুখ, তৃষ্ণা-ঘৃণা পুঞ্জিত
সুগভীর ত্বকের সীমানা
বন্যার প্রবল ইন্দ্রিয়ের সত্যকে
আমার হৃৎপিণ্ডের মতো
আমার সত্তার মতো
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
আমার দেহের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত।"

[অনন্য স্বদেশ/বিমুখ প্রান্তর, পৃ. ৬৩
হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলি, প্রথম খণ্ড]

www.nagorikpathagar.org

হাসানের ভাষা ও স্বদেশ চেতনা শাশ্বত, ধ্রুবপদ চেতনারই অনুষঙ্গী। কখনো পেলব-গীতল, কখনো জাঢ্য-জটিল-কঠিন, কখনো স্রোতস্বল গতিধারায় মাত্রা পেয়েছে তাঁর কবিতা। এখানে তাঁর আদিম অক্ষর রাশি কবিতা খণ্ড খণ্ড স্তবক উদ্ধৃত করা হলো :

"পলিরঙ হাত দিয়ে আঙ্গার কালো শ্লেটের ওপর
যখনই প্রথম লিখলে আদ্যাক্ষর
লিখলে একটি একটি সভ্যতার নাম।
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আলাওলের হাতে তুলে দিয়ে কুন্দকুসুম,
প্রীতি উপহার বিনিময়ে পেলে ছাড়পত্র হাতে
নজরুল-রবীন্দ্রের মহতী সত্তার।

.....

.....

একবার বাঙলার রোদ জলে বেড়ে ওঠে
কংক্রিটে অথবা পিচে যে পথেই হাঁটি না কেন,
যত দ্রুত যাই প্লেনে কিম্বা কারে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে
যতই ঠেকাই না আদিগন্ত আবহাওয়া আদিম অক্ষর রাজি
অ আ ক খ আমাকে রেখেছে ধ'রে।
গলায় ফোটে না স্বর যদি না দূর পিতা পিতামহের
কণ্ঠে কণ্ঠ রাখি, চেতনায় ফোটে না একটিও ফুল
যদি না বাঙলার বর্ণমালা শিখে থাকি।"

[আদিম আক্ষর রাশি/পৃ.১৩৯
হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলি, প্রথম খণ্ড]

বজ্রের মতো ধ্বনি তুলে তিনি তাঁর জীবন যন্ত্রণাকে বহুমাত্রিক বাকপ্রতিমায় সজ্জিত করে তুলতে পারেন। অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, উৎক্ষিপ্ততা যে কি রকম চিত্র কল্পময় হয়ে উঠতে পারে 'আমার ভেতরের বাঘ' এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

"আমাকে বলেছিলাম, ধ্বনি হয়ে যা,
গাছের শরীর থেকে পাতা পতনের যে শব্দ ঝরে

www.nagorikpathagar.org

সেই অস্ফুটকেও টঙ্কার করে তোল
আমাকে বলেছিলাম, স্রোত হয়ে যা,
লক্ষকোটি তরঙ্গের গতি শুষে নিয়ে ফুটে ওঠ তুই।
আমাকে বলেছিলাম
তুই গান হয়ে যা, তুই সংগ্রাম যা তুই আনন্দ হয়ে যা।
যত সুন্দর তুই খুঁজে পেতে নিয়ে আয় এক ঘরে।
.....
.....
.....
আমার ইচ্ছের চেয়ে বড় বেশি খাট আমি
আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথিবীটা বড় বেশি ছোট
আবার স্বপ্নের চেয়ে অনেক অর্থাৎ অতিরিক্ত নীলিমা মার্জিত ঐ মস্ত আকন্দ।
এইটুকু বুঝি, তাই নিসর্গ তোমাকে খুব করে বুঝতে চেয়ে
আমি খুব বেশি অবাক হই না আজকাল।"

[আমার ভেতরের বাঘ/পৃ. ৪৫
হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড]

www.nagorikpathagar.org

নীড় তার নীড় নয় অনিত্যের কোলাহল

চল্লিশ দশকের দীপিত ও প্রবল পটভূমিতে তালিম হোসেনের আবির্ভাব। কবি তালিম হোসেন তাঁর স্বজাতি, স্ব-সমাজ, স্ব-সংস্কৃতিকে পুনঃস্থাপিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন আজীবন। বিশ্ব-মুসলিম জনজীবনের মনুষ্যত্বের চেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে এ প্রাণস্রোত বইয়ে দিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের সততা ও শুদ্ধতা থেকে। দিশারী কাব্যগ্রন্থ এ বিশ্বাস সংগ্রামেরই প্রতীক হয়ে উঠেছিল সেদিন। ১৯৪৭ সালের ভারত ডোমিয়নের স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্তগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর এ প্রথম কাব্যগ্রন্থটিতে। আসলে তালিম হোসেনের কাব্যে মুসলিম জীবনবোধ ও জীবন সংবিৎ উদ্দীপ্ত হয়েছিল শতভিষার মতো। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের সম্ভাবনা, মানুষের সত্তার স্বভাব-উদ্ভাস তাঁর কাব্যে ও মানব অস্তিত্বের সম্পূরক মনে করতেন তিনি। মানুষের পৃথিবীকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের অগ্নিকাণ্ড বিভা। সৌমনস্যতার উজ্জ্বল কান্তি। মানুষে মানুষে এই জগতে, বিশ্বসংসারের মনস্বিতা, সম্প্রীতি ও সমমর্মিতা স্থাপনের জন্য তালিম হোসেন নিঃসন্দেহে উচ্চকণ্ঠ কবি প্রবর। মানবজীবনের সামুদ্রিক স্বস্তি, শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের নিমগ্ন মুহূর্তগুলোর স্বপ্ন দেখেছেন কবি। মানুষের কল্যাণ এবং প্রকৃতির সুষমা সাম্যে গড়ে ওঠা ভবিষ্যতের স্বপ্নে মগ্ন এই কবি মূলতই মানবতাবাদী, শান্তিবাদী। এই কবির কাব্যে আমাদের বৃহত্তর সমাজজীবনের ব্যবহারিক শব্দপুঞ্জ মূর্ত হয়ে উঠেছে-ধ্বনিমাধুর্যে এবং সুন্দর সুষম ব্যঞ্জনায়। তাঁর কবিতায় মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতিস্পন্দন এবং চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। এক জীবন্ত বাঙালি সত্তার সঙ্গে উদার মানবিক সত্তা এসে সাবলীলভাবে মিশে গেছে। অন্তর্লীন হয়েছে শান্তি ও সাম্যের সুললিত সঙ্গীতের ধ্বনি তরঙ্গ। এই নিরিখে কবি তালিম হোসেন কাজী নজরুল ইসলামের উত্তরসূরি ও মানস সহযাত্রী। তালিম হোসেনের কবিতায় সেই শব্দ বন্ধের শৃঙ্খলা ও সমন্বিত মাত্রা রেখায়িত হয়েছে। এই বিবেচনায় কবি তালিম হোসেন উচ্চকণ্ঠ কবিতায় বিকাশ ও বিবর্তন রেখার সামীপ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

কবি তালিম হোসেন কাল সচেতন, যুগ দিশারী মানবতাবাদী কবি। 'দিশারী' কাব্যে এই কাল সচেতনা, যুগ দিশা এবং মানবতার প্রখর দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছে।

"শতকের নিশি-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
সন্ধানী দীপ আমার জোহরা তারা
কোথায় কখন নীহারিকা পথে ফিরে
সুপ্তির ক্ষণে অলক্ষ্যে হলো হারা।
সেই তারা দীপ জ্বালব আবার আমি
এখানে আমার কাফেলা যাবে না থামি।"

[দিশা/কবিতা সমন্ত্র : তালিম হোসেন/পৃঃ ৩৭]

তিনি আবার মানবিক আশঙ্কা এবং অভীপ্সার আবর্ত থেকে ঘোষণা করেছেন-

"নিরন্দ্র এক জামানার জিন্দানে
ভেঙেছি আগল সেদিন বন্দী রাতে
সড়ক কেটেছি মৃত অরণ্যতলে।
ঘন জুলমাতে আলোকের বন্যাতে।
কোথা মানবতা নির্জিত বেদনায়,
কোথা ইনশান খিন্ন বিষাদে কাঁদে
কোন খান্নাস অশুভ মন্ত্রণা দিয়ে
বণি আদমেরে ফেলে মৃত্যুর ফাঁদে
লোভ আসাম্য হিংসা দৈন্য ঘেরা
মোহ দুস্তর ভুলের পরিখা-পারে
ইনসানিয়াত বিকৃত হলো যেথা,
বিশুষ্ক হলো ইবলিস-কারাগারে
চির-মানুষের বাহবার মুসলিম
সেখানে দিয়াছি আলোকের তসলিম,
সেখানে এনেছি মনজিল দিশা-'সিরাত মুস্তাকীম'।"

[দিশা/পৃ : ৩৭]

www.nagorikpathagar.org

নিরন্ধ্র-নিশ্চিন্দ্র অন্ধকার কালের কারাগারে কোটর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে কবি নতুন পথের সেতুবন্ধন রচনা করতে প্রয়াস করেছেন এখানে। আলোর বন্যায় ভাসিয়ে নিতে চেয়েছেন বন্দীরাতের তমিস্রা, মৃত অরণ্যতল। মনুষ্যত্বের বিকৃতি ও বিভ্রম দেখে কবিচিত্ত ব্যথিত, বিহ্বল, জর্জরিত। অসুরের অশুভ মন্ত্রণাও তিনি উপেক্ষা করেছেন। মানব জাতিকে মৃত্যুর ফাঁদে ফেলে মনুষ্যত্বের যে মুক্তি নেই সেই ভুলের পরিখার প্রান্ত থেকে তিনি মানবতা ও মনুষ্যত্বকে মুক্ত করতে চান। তিনি তো আলোর দিশারী।

"খুদীতে দৃপ্ত অভিযান সেই
আনন্দ-বন্দরে
শোষণ শাসন-পীড়ন মুক্ত,
প্রশান্তি পথ ধরে।

এই মিছিলের অগ্রনায়ক হয়ে।
এসেছি সেদিন অনন্য পরিচয়ে।"

কবি এখানে আত্মস্বীকৃত দিশারী। তাঁর কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই। কাজী নজরুল ইসলামের আত্মবিশ্বাস, দ্রোহ চেতনা এবং ইকবালের খুদী চেতনায় সমৃদ্ধ সংক্ষুব্ধ-সম্বুদ্ধ তালিম হোসেন মানবিকতার অক্ষরেখাটি স্পর্শ করতে চেয়েছেন নিরন্তর। তাঁর হাতে আলোর পতাকা। তিনি আলোর কাফেলার দিশারী। আলোকের নিঃশঙ্ক পথযাত্রী।

"চিরনিশীথের আলোর কাফেলা
সূর্যের অভিসারী পথিক,
হাতের মশাল দেখাও যুগের
দিকভ্রান্তেরে হারানো দিক।"

[আলোর কাফেলা/কবিতা সমগ্র : তালিম হোসেন পৃ : ৩৯]

তালিম হোসেন অসম সাহসী এক অভিযাত্রিক কবি। জীবনের পশ্চাতে অসংখ্য প্রেত-ছায়া পদপাতে পিষ্ট করে সুদূরের পথে পাড়ি জমাতে প্রয়াস পেয়েছেন কবি। দুর্যোগ রাত্রির পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। মুক্তির আলোক চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে যান জীবনের সঠিক নিশানা। সুনির্দিষ্ট সন্ধান। 'হে অভিযাত্রিক' কবিতায়

www.nagorikpathagar.org

তিনি উচ্চরণ করেন।

"তোমার সম্মুখে আজ শোণিতাক্ত যুদ্ধের ময়দান,
তোমার পশ্চাতে আজো প্রেত ছায়া-জিঞ্জীর জিন্দান;
তবু আজ-হে অভিযাত্রিক,
তোমাকে চলতে হবে স্থির লক্ষ্যে দুর্বার নির্ভীক।

তোমার অন্তরে নেই মানুষের অধিকার নাশা
উদ্ধত অন্যায় লোভ, হিংসায় বিকৃত কোন আশা।
দুর্যোগ রাত্রির পারে শুধু তব জর্জরিত প্রাণ
মুক্তির আলোকে চায় জীবনের সঠিক সন্ধান।

তুমি চাও মানুষের অধিকার-বাঁচার সম্মান
দুর্বলের মজলুমের ফরিয়াদ তুমি করো গান
বিদ্রোহীর দৃপ্ত কণ্ঠেঃ স্বার্থ-অন্ধ কোলাহল মাঝে
একান্তে আজিও তবু তোমার শান্তির বাণী বাজে-
সত্যের মর্যাদা দাও, অধিকার মেনে নাও বীর;
জাগো হে মহৎ প্রাণ, জাগো জ্যোতি কল্যাণ-বুদ্ধির!"

[দিশারী/কবিতা সমগ্র : তালিম হোসেন পৃঃ ৪১]

কবি তালিম হোসেন জীবন পথের এক নির্ভীক অভিযাত্রিক। তাঁর অভিযাত্রিকতায় অমন সাহসিকতার পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। চিহ্নিত হয়েছে স্থির লক্ষ্যে পৌছানোর দিক সীমা।

"বিকট নখর দন্তে তবু আসে সম্মুখে তোমার
স্বার্থের করাল মূর্তি, জালিমের হিংস্র তরবার।
মিথ্যার মহল হতে সত্য-সুন্দরের অভিসারে
তুমি হের অবরোধ অসুন্দর কণ্টকের ভারে।

অগ্রসর হতে হবে, বিজয়ী হতেই হবে তবু;

www.nagorikpathagar.org

নতুন শপথ নাও- অন্যায়ের ডরিবনা কভু
যত সে দুরন্ত হোক; যত তার উদ্ধত হঙ্কার
তোমার চরণ তলে লেখা হবে পরাজয় তার।
অন্যায় যে করেনি ন্যায় যুদ্ধে সে বিজয়ী বীর,
ভেঙে পড়ে তার পথে অসত্যের পাষাণ প্রাচীর।

আবার ঘোষণা কর শান্ত কণ্ঠে -শোন হে মানুষ,
মোহ ধ্বান্ত চিত্ত 'পরে হানো আজ আলোর অঙ্কুশ।
তোমার ব্যক্তির চাপে বৃদ্ধ জীবনের পাপে-তাপে
বৃহৎ সংসার যেন অশান্তির কলঙ্কে না যাপে।"

[হে অভিযাত্রিক/ঐ]

'বিকট নখরদন্ত' স্বার্থের করাল মূর্তি, মিথ্যার মহল, অসুন্দর কন্টকের ভারে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত সময় ও সমাজের নাগপাশ ছিন্ন করে দিয়ে কবি কেবল দুর্নিরীক্ষ পথেই তাঁর অভিযান অব্যাহত রাখতে চান। অসত্যের পাষাণ প্রাচীর ভেঙে ফেলে তাঁকে জীবনের ন্যায়যুদ্ধে বীরের মতোই বিজয়ী হতে হবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, কবি তালিম হোসেন মানুষ ও মৃত্তিকামগ্ন কবি। তিনি যখন মানুষকে খোঁজেন তখনই মৃত্তিকামগ্ন হয়ে পড়েন। আবার মৃত্তিকা যখন করতলে তুলে নেন, অন্তরের কন্দরে স্থাপন করেন শ্যামধূসর ধূলিকণা মানুষের মৃন্ময় স্পর্শে অভির্ভূত হন। দেশ মাতৃকার মৃত্তিক অস্তিত্ব অনুভব করেন হৃদয়ের ঐকান্তিক আতিশয্যে। 'এই দেশ মহীয়ান' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ছায়াঘন শ্যাম নয়নাভিরাম এই দেশ মহীয়ান।
এই সুখ-নীড়ে জীবন যাপি রে, গাহি এরি জয়গান
এ মাটির প'রে পথে প্রান্তরে আছে যত পদ রেখা-
মায়ের বুকে সে আমাদেরি স্নেহ মধুর সোহাগে লেখা,
আমরা তাহার আদরের নিধি, বেদনার অবদান ॥
এই আলোছায়া, বনানীর মায়া বেঁধেছে মোদের হিয়া,

www.nagorikpathagar.org

বৈশাখী ঝড় শূন্য প্রান্তর ফিরেছে সঞ্চারিয়া;
নভে মেঘদল এনেছে উছল চির শ্যামলের বান ॥
এই মাটি-জলে রৌদ্রে-বাদলে যুগ যুগ করি খেলা
সোনার ধান্যে মধু নবান্নে মোদের কেটেছে বেলা,
ফুলে ও ফসলে এ মাটির কোলে নেমেছে গুলিস্তান॥
হেথা পল্লীর শান্ত কুটিরে, মাঠে নদীতে প্রাণ;
দুঃখ ও সুখে বাজে রাখালিয়া, চলে ভাটিয়ালী গান।
স্নিগ্ধ সুধার এই সংসার ধরাতলে গরীয়ান॥

মানুষের ঘর বেঁধেছি হেথায় মানুষের সন্তান,
মিলেছি সাম্য-মৈত্রীর নীড়ে হিন্দু মুসলমান,
হেথায় জীবনানন্দে দীপ্ত চির-মানুষের প্রাণ॥"

বাংলার ছায়াঘন শ্যাম শোভিত পরিবেশে কবি জীবনানন্দ দীপ্ত, উজ্জীবিত। এ বাংলা সাম্য মৈত্রীর নীড়। এখানে জাতীয় সম্প্রীতি অটুট। এখানে মধু নবান্নে জীবনের শত বেলা কেটে যায়। এ যেন এক 'স্নিগ্ধ সুধার' মানব সংসার। কবি তালিম হোসেন বাংলার এক স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দেশাত্মপ্রবর কবি। কবিরা শান্তির দূত। শান্তির বাণী বয়ে বেড়ান নিজ দেশ থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রান্তরে। তারা অবলোকন করেন। পৃথিবীর আর সূর্যের পরিক্রমা, মিটমিট করে জ্বলা তারার ইশারা। ক্ষণভঙ্গুর সংসারের শুধু ক্ষণভঙ্গুরতা নয়, দেহের নশ্বরতা শুধু নয়-ঊর্ধ্বে উঠে কবি আত্মার অবিশ্বরতার কথা ভেবে আত্মার অলিন্দেই যেন সুখ আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। স্ফূর্তি, পরামানন্দ। শান্তির পরমতা পার্থিবতায় নেই। আত্মার অলিন্দে-জ্যোতির্ময় মহলে শান্তির বসবাস।

"পৃথিবী আর সূর্যের পরিক্রমা : দিন-রাত্রির আবর্তন,
চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি : মিটিমিটি-জ্বলা তারার ইশারা,
মেঘ-বৃষ্টি-আবহাওয়ার পরিবর্তন : ফুল-ফসলের নব-নব মৌসুম
বিশ্ব-জগৎ প্রবাহের এই সুনিয়ন্ত্রিত ধারা!...
হে বনি আদম!

www.nagorikpathagar.org

তোমার নিজের প্রকৃতি ও আত্মার পরে এক অবিনশ্বর
পরমাত্মিক জগতের সুমিত নিয়ন্ত্রণকে অবহেলা ক'রে
কতকাল আর তুমি ছন্দপাত ঘটিয়ে চলবে?
শান্তি কী : শান্তি কোথায়: কার জন্যে শান্তি?
বুদ্ধের দিকে চেয়ে দ্যাখো :
শান্তিকে পেয়েছিলেন তিনি বিশ্ব-আত্মার মাঝে।
সে বিশ্বকে তুমি করেছো পর;
খ্রিষ্টের দিকে চেয়ে দ্যাখো :
শান্তিকে পেয়েছিলেন তিনি পরমাত্মার মাঝে
সে পরমকে রেখেছো তুমি বাহির দ্বারে;
মুহম্মদের দিকে চেয়ে দ্যাখো :
শান্তিকে পেয়েছিলেন তিনি আত্মার মাঝে-
সে আত্মাকেই আজ তুমি করেছো অস্বীকার!"

উপরে উদ্ধৃত 'শান্তির জন্যে' কবিতায়-কবি শান্তির সন্ধান করেন। শান্তি কি? শান্তি কেন? শান্তি কোথায়? কবি শান্তির অন্বেষায় প্রশ্ন তোলেন। বুদ্ধের দিকে, খ্রিষ্টের দিকে মুহাম্মদের (দ:) দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেন আমাদের, সকলের। সমগ্র মনুষ্য জাতির বুদ্ধ বিশ্ব আত্মায় খ্রিষ্ট পরমাত্মায় আর মুহাম্মদ (দ:) আত্মার উদ্যানে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। ধ্যানীর আধ্যাত্ম-মানুষের। সেই শান্তির বাণী যুগে যুগে এসেছে। 'আশার ফলকে লব্ধ' সেই চিরন্তর বাণী আজও ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে উদ্ধার করতে পারে। এ উদ্ধার আশ্বাস তাঁর কবিতায় অনুরণিত হয়েছে বহুবার বহু ব্যঞ্জনায়। শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্বস্ত এবং সুখানুভূতি বিশ্ব জগত প্রবাহের এক সুনিয়ন্ত্রিত ধারা।

"ধ্যানীর আধ্যাত্ম-মানসের সেই শান্তির পয়গাম যুগে যুগে এসেছে
অশান্তি-পীড়িত, সপ্রশ্ন, উচ্চকিত মানুষের দুয়ারে-
"ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে!"
সেই ধর্ম- আল্লাহর সেই দীন' একদিন পূর্ণ হলো, পরিণত হলো...
"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম

www.nagorikpathagar.org

ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতী,"

আত্মার ফলকে লব্ধ মুহাম্মদের সেই শ্বাশত পয়গাম

সেদিনের বিপর্যস্ত ধ্বংসমুখী মানবতাকে দিলো

পরম শান্তির-উজ্জ্বলতম-পরিণতির আশ্বাস।

ধর্মকেও করেছিলে তুমি খোদপরস্তীরই অবলম্বন;

"বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, মুহম্মদ তো দাঁড়িয়েছেন একা-নিঃসঙ্গ;

অনেকের সঙ্গ, বিশ্বের সঙ্গ তবু তারাই জয় করলেন।"

[শান্তির জন্যে/কবিতা সমগ্র : তালিম হোসেন পৃ: ১২৪]

কবি এখানে একা-নিঃসঙ্গ নবীর মতো। কিন্তু সমাজ, কালও পৃথিবীর সঙ্গতা তাঁকে স্পর্শময় করে, সামীপ্যময় ও সান্নিধ্যময় করে। এই স্পর্শময়তা ও সামীপ্য কবির পরম প্রত্যাশা। কবি যখন শান্তি প্রত্যাশা করেন সে-শান্তি যেন তাঁর আত্মার সুবিমল কিরণ।'

"ধ্যানবর্জিত জ্ঞানের এই সভ্যতার কাছে হে বনি আদম,

বলো আরো কী চাই তোমারে?"

[শান্তির জন্যে/ঐ]

নিত্যকার এ জগত সংসারের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সজ্ঞা এবং মননের অনুপস্থিতি ঘটে গেলে মানব সভ্যতার পরতে পরতে সঙ্কট ঘনীভূত হতে থাকে। কবি সতর্ক দৃষ্টিতে, মূল্যবোধের নিরিখে বিপর্যস্ত বস্তু বিশ্বকে নিরীক্ষণ করছেন। জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ-এই তিন চেতনা সমসাময়িক পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের বেশি আলোড়িত ও আন্দোলিত করে। আমরা জানি স্ব-জাতি, স্ব-সমাজ এবং স্ব-দেশ এখন বিশ্ব-গ্রামের (global village) অন্তর্বর্তী। যখন একটি মহান অন্তস্রোত এক হয়ে মিশে যায় একই মানবমোহনার দিকে তখন মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিপ্রেরণার উৎস হয়ে পড়ে মাত্র একটিই পৃথিবী। এক মানববসতি। এখানে সকল বৈপরীত্য সমন্বিত বৈচিত্র্যে অন্তর্লীন হয়ে যায়। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত মানবনিয়তির সমন্বয় এবং সংস্থিতি ঘটে যেতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। আধুনিক মানুষের এই লক্ষণ এবং আকাঙ্ক্ষা রুচি, মর্জি, মানস থেকে গ্লোবলাইজেশনের ধারণার বীজটি সময়ের সিঁড়ি ও নানা ধাপ, বাঁক ধরে মোড় ফিরে ফিরে অঙ্কুরিত হতে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের প্রক্রিয়াটিই যে বিশ্বসংগ্রামের চেতনার জনপ্রিয়তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি তালিম হোসেন জীবনের সূচনা পর্ব থেকেই সম্পূর্ণভাবে দেশাত্ম এবং মৃত্তিকামগ্ন। আবার কতটা সময় রোমান্টিক আবহে আলো-আঁধারে উদ্ভাসিত এবং নিমজ্জিত। শিল্পের এই জমিনে তাঁর পদচারণা ঐকান্তিক এবং হার্দিক সেটা স্পষ্ট করেই বলা যায়। চল্লিশ দশকের অন্তর্স্রোতে প্রবাহিত তাঁর চেতনা মনন এবং মনস্বিতা নির্ভীক অভিযাত্রিকের ঋজু, ঋদ্ধপথের সন্ধান করেছে বারবার। তাঁর ছিল একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টিশীল কালমিতি। কবিতার ভেতরকার আত্মার সুষমাকে ধারণ করতে সর্বতো প্রয়াসী ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন বিহঙ্গ উড়ে উড়ে গিয়েছে একটি দিগন্ত থেকে অন্য একটি দিগন্তে। বিহঙ্গের দুরন্ত পাখায় ঝাপ্তা প্রবাহ যেন সাত আকাশের ঝড় প্রচণ্ড শব্দ তুলে ডাক দিয়ে যায়। আকাশের চাঁদোয়ার নীচে কি এক নিবিড় স্বপ্ন অন্তর্লীন। এ বিহঙ্গ নীড়ে চোখ খুঁজে বসে থাকবার নয়। আকাঙ্ক্ষার আততি নিয়ে এ বিহঙ্গ আবার আকাশ পথে উড্ডীন অন্ধকারের সায়ক বেঁধা পাখি ব্যর্থতার গ্লানি মুখে ফেলে আলোকের স্তুতি করে যেতে থাকে বিরাম বিশ্রামহীনভাবে। উঁচু পাহাড় চূড়ায় তার 'আশিয়ানা'। উর্ধ্বলোকে তার আশার আলয়, মুক্তির ঠিকানা। একদিন যে পাখি কেবল ছিল কূলায় প্রত্যাশী। যে কূলায় ছিল প্রতিদিন ফিরে আসা-সেই কূলায় ফেরা পাখি- নীড়ের বন্ধন ছিন্ন করে কোথাও যেন উধাও নিরুদ্দিষ্ট। অন্য কোথাও অনিত্যের কোলাহলে নিতান্ত নিমগ্ন। কবিও আত্মনিমজ্জনে বিভোর হন। 'ধ্যানীর' তাপস বিবিক্ত আত্মা' পরম সন্ধানে নিবিড় নৈঃশব্দের ব্রত পালন করেন। জীবাত্মা খোঁজে পরমাত্মাকে। পরম প্রাপ্তির প্রত্যাশা তো চিরন্তর। কবির বিহঙ্গ ও শাশ্বত। 'শাহীন' সে বিহঙ্গ গতির, শক্তির, ঝঞ্ঝার, প্রচণ্ড বাত্যার। সপ্ত সিন্ধু সপ্ত দিগন্তের পাখি তার পাখসাটের শব্দে শুধু ডাক দিয়ে যায়। কবি তালিম হোসেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের 'শাহীন' কবিতায় জীবনের সেই বজ্রঝড়ের মুখোমুখি হন।

"শাহীনের দুরন্ত পাখায়
সাত আকাশের ঝড় ডাক দিয়ে যায়
নিম্নে নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলে
অন্তরীণ তার স্বপ্ন যায় না বিফলে-

www.nagorikpathagar.org

(সুপ্তির বিবরে বন্দী যেমন নির্জিত প্রাণ
ইচ্ছার আকুতি
অন্ধকার-বিদ্ধ স্বপ্নে করে ব্যর্থ আলোকের স্তুতি)
সুউচ্চ পাহাড় চূড়ে তার আশিয়ানা
নিরুদ্ধ প্রান্তরে দেয় ঊর্ধ্বলোকে মুক্তির ঠিকানা-
অবরুদ্ধ প্রত্যহের নিম্নমুখ মনের কিনারে
যেমন আজান ওঠে জনপদে
উচ্চশীর্ষ মসজিদ-মিনারে।
নীড় তার নীড় নয়; অনিত্যের কোলাহল
নিমগ্ন যেখানে,
ধ্যানীর বিবিক্ত আত্মা যেখানে নৈঃশব্দ-শীর্ষে
ব্রতী হয় পরম সন্ধানে-
সেখানে সে অধিষ্ঠিত। তিমির-সমুদ্রতল থেকে
উচ্চশির ঊর্ধ্ববাহু- যেখানে একাকী রয় জেগে
প্রবাল দ্বীপের বুকে পথের দিশারী বাতিঘর,
নিরুদ্ধ প্রান্তর থেকে সেইখানে শোনা যায়
শাহীনের স্বর।"

'নীড় তার নীড় নয়।' কূলায় ফেরা পাখি আর কূলায় থেকে কোথায় উধাও? 'অনিত্যের কোলাহলে' কেনই বা সে নিমগ্ন? কোথায়, কিসের সন্ধান করে ফেরে সে? 'প্রবাল দ্বীপের বুকে পথের দিশারী বাতিঘর' জেগে আছে একাকী। সেইখানে, সেই নীলিম নিঃস্বন প্রান্তরে শাহীনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে পাখির ডানা সুদূরপ্রসারী। সে পাখি ঊর্ধ্বে উড্ডীন এবং ঊর্ধ্বমুখী।

www.nagorikpathagar.org

কবির বিভাব কবির বিভাস

বাংলা সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতির স্থিতধী পুরুষ সৈয়দ আলী আহসান-স্বভূমি, স্বদেশ, স্বকাল তাঁর জীবন আধার। স্বভূমে, স্বদেশে স্বকালে তাঁর জীবন চর্যার এক সার্থক পরিণতি। মানবজীবন যখন পরিণতি পরিসরে উপনীত হয়-তখনই জীবন সমুদ্রের উপান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। একটি প্রান্ত থেকে, সমুদ্রের একটি কিনার থেকেই নাবিককে যাত্রা করতে হয়। অন্য প্রান্তের অন্য কোথাও অন্য উপকূলে পৌঁছানোর জন্য। এ নিঃসঙ্গ নাবিক যাত্রা করেছেন একাকী, কিন্তু অনেক পথের দিকচিহ্ন তাঁর সম্মুখে। যে পথ নির্জন অনিঃশেষ। শাশ্বত গতির পদচিহ্ন রেখেই তো মানুষের যাত্রা। কবি জীবনে অর্জন করতে চান তাঁর নিজেরই পরিসীমার ওপার থেকে। কোনো অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের আলো থেকে। সান্নিধ্যের শতভিষা যখন জ্বলে ওঠে তখনই জীবন পরিতৃপ্ত হয়। পরিপূর্ণ হয়। জীবনের ভেতর দিয়ে এ পরিপূর্ণতা আসে। আবার মৃত্যুর ধূসর মোহন মৃত্তিকালোকে গিয়েও এ পরিপূর্ণতা আসতে পারে। সৈয়দ আলী আহসান জীবনকে মৃত্যুর পরিপূরক জ্ঞান করেন। এখানেই তাঁর বিশ্বাসের বিভাব জীবনের বাস্তভুমে এসে সমাগত। তাঁর বিশ্বাস সহস্র ঔজ্জ্বল্যে সমাকীর্ণ। আলী আহসান তাঁর আত্মজৈবনিক ভাষায় বলেন :

> *"মানুষের জীবনে বিশ্বাসের বিকল্প নেই। বিশ্বাসটি হচ্ছে অস্তিত্বের যথার্থ রূপকার। আমরা যে পৃথিবীতে আছি এবং জীবনযাপন করছি তার পরিচয়টি বিশ্বাসের অঙ্গীকারের মধ্যে ধরা পড়ে। একজন মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন উপরকণ দ্বারা বিমুগ্ধ হয়। সে তার অল্প সময়ের অবস্থানে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করে এবং নিজে সৌভাগ্যবান হয়। সে কিন্তু জানে যে, তাকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে এবং সে এটাও জানে যে, তার মৃত্যুর পর পৃথিবী থাকবে, সৌভাগ্য থাকবে এবং সমৃদ্ধিও থাকবে। আমরা বৃহৎ বৃক্ষকে দেখি, পর্বতকে দেখি, স্রোতবাহী নদীকে দেখি; শৈশবে এদের যেভাবে দেখি, অন্তিম সময়েও সেভাবেই দেখি। আমাদের চলে যাবার পরও এরা যে থাকে এ বিশ্বাস*

www.nagorikpathagar.org

আমাদের মনে জন্মায়। এই বিশ্বাসটিকে মান্য করাই হচ্ছে জীবনের সত্যতাকে স্বীকার করা। এভাবেই বিশ্বাসের কাছে আমরা দায়বদ্ধ।"

[আমার জীবন এবং আমার বিশ্বাস- সৈয়দ আলী আহসান]

আলী আহসান তাঁর বিশ্বাসকে অস্তিত্বের রূপকল্প বলেছেন। বিশ্বাসের রূপরেখা ছাড়া মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আলী আহসান পৃথিবীর বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা বিমুগ্ধ হন- তাঁর জীবনের অন্দরমহল সমৃদ্ধ ও বাসোপম। প্রফেসর আলী তাঁর চেতনার সম্বুদ্ধতায় বলছেন :

"প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান হতে পারে না, আবার যিনি ধ্যানহীন তার প্রজ্ঞাও উৎপন্ন হতে পারে না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনিই নির্বাণের সন্নিকটে অবস্থান করেন। অস্তিত্বের বিরাট ধারাক্রমকে বুদ্ধ স্বীকার করেছিলেন এবং তাতেই প্রমাণ হয় যে তিনি একজন মহৎ বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিশ্বাসের জন্য যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন তা একটি বিশেষ ধরনের।"

[আমার জীবন এবং আমার বিশ্বাস -সৈয়দ আলী আহসান]

প্রফেসর আলী ধ্যান ও প্রজ্ঞার সম্মিলন ঘটাতে প্রত্যাশা করেন। অনড় প্রত্যয়ে। কবির ধ্যান ও অনুধ্যান কি? জীবনের রহস্যনিচয় শুধু উন্মোচন করা। মহাপৃথিবীর জিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া। বর্তমানতার সঙ্কীর্ণ ঝরোকার কপাট খুলে ফেলে দিগন্তের পটে স্মৃতিচিহ্ন এঁকে দেয়া। এই যে মানবজীবন, এই যে বিশ্বপ্রকৃতি এর উৎস কোথায়? আমার উৎসমূলে কোন আদি? কোন মহা অনাদি? আলী আহসান তাঁর কাব্যে, তাঁর চেতনাপুঞ্জে এই জিজ্ঞাসার উত্তর মেলাতে চান। প্রেমে, প্রণয়ে, ভালোবাসায়, প্রতীতি-প্রত্যয়ে এর মীমাংসা খোঁজেন। কাছের বিষয়কে মানুষ দূরের করে ভাবে। আবার দূরের দূরাত্যয়ের প্রপঞ্চকে কাছের করে নিয়ে আসে। এই যে ক্রমাগত 'নিয়ে আসা' এই 'নিয়ে আসার' একটা অদৃশ্য দোলাচলে মানুষেরা দোলায়মান। আমাদের জীবনের দায় অনেক। আমরা শোধ করতে পারি না সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্রও। কালের যাত্রাপথেই মানুষের নিত্যদিনের পদচারণা। কোনো খণ্ডিত কাল নয়, অনন্তকালের উদ্দাম প্রবাহে তার

www.nagorikpathagar.org

ক্ষণকালীন পদচিহ্ন মাত্র এঁকে দেয়া। খণ্ডিত কালের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে মানুষেরা যেতে চায় বহুদূরে। কিন্তু কতদূরই বা সে যেতে পারে? তবু জীবনে যে কোনো নেতিবাচকতা নেই-আলী আহসান তারই নির্দেশ দেন এভাবে।

"যারা নেতিবাচক ইঙ্গিতে সবকিছুকে অস্বীকার করতে চান অনেকে তাদেরকে বিদ্রোহী বলেন। এখানে বিদ্রোহের কি আছে, আমি কখনও বুঝে উঠতে পারিনি। সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে যে সাহসের প্রয়োজন শূন্যতার মধ্যে সে সাহস নেই।"

[আমার জীবন এবং আমার বিশ্বাস–সৈয়দ আলী আহসান]

সত্যকে সত্য জ্ঞান না করে সত্য বর্জন করার মধ্যে আনন্দ নেই। অহমিকার আগুন আছে। যে আগুনে সত্যবর্জনকারী নিজে নিজেই দগ্ধীভূত হয়। মিথ্যাকে অস্বীকার করার ভেতর বিদ্রোহ আছে। আগুন আছে। এ আগুন চেতনার শিখায় প্রোজ্জ্বল্যমান।

"বৌদ্ধরা যে শূন্যতার কথা বলেন, সেটি নাস্তিক্যবাদ নয়, সেটি হচ্ছে অস্তিত্বের অনন্ত ধারার একটি স্বীকৃতি। গৌতম বুদ্ধ পরহিত সাধনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, বোধির সাধককে সর্বদা শক্তি আশ্রয় করে চলতে হবে। বিষাদ এবং অনধ্যবসায় অবিশ্বাসের জন্ম নেয়; সুতরাং মানুষকে তৎপর হতে হবে সকল অশুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রজ্ঞার উপর এবং ধ্যানের উপর।"

[আমার জীবন এবং আমার বিশ্বাস–সৈয়দ আলী আহসান]

আলী আহসান তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

"পৃথিবীতে থাকবে পথচারীর মতো
শুধু গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হবে
কিন্তু কখনও থামবে না,
কেননা তুমি তো অতিথি
তোমার তো বাসস্থান নেই।
যখন সন্ধ্যা হবে
প্রত্যুষের জন্য প্রতীক্ষা করো না

www.nagorikpathagar.org

যখন সকাল হবে
তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না
জীবনে ইচ্ছা করো
মৃত্যুকে ইচ্ছা করো না-।"

মানুষ এ পৃথিবীতে যেন এক মহা অতিথিশালার বাসিন্দা। এখানে জীবনের আতিথ্য যত বেশি গ্রহণ করতে পারে তার কাছে অতিভোগ্য উপাদেয় হয়ে ওঠে এই সময় বৃন্তের পুষ্পপল্লব। একটি দিন থেকে একটি দিনের অবসান– একটি রাত্রি থেকে একটি রাত্রির বিলয়– একটি সূর্যোদয় থেকে একটি সূর্যাস্তের আলো-আঁধারির ভেতর মানুষের বসবাস। কবির প্রত্যাশা কি এখানে এই ধূসরাভ মৃন্ময় পৃথিবীতে? পৃথিবীর প্রতিদিনের প্রত্যুষ, জীবনের বিমর্ষতা নয় বরং অন্তহীন প্রসন্নতা মৃত্যুর মধ্যে নয় জীবনের মধ্যে, আচরিত অনুধ্যানে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। এই বিপুল পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে কত আলো। কত বর্ণাঢ্য বিভা। কবি বলেন :

"বিপুল পৃথিবীর জন্য
আকাশ একটি দূরাশ্রিত আলো
একটি অসম্ভব শূন্যতায় সময়ের অতল,
যেখানে প্রতিবিম্বহীন জিজ্ঞাসা
প্রত্যুষের অথবা সন্ধ্যার তারার।
সেখানে অন্ধকার আলোর অবশেষে
অনবরত হৃদয়ের প্রজাপতি
যাদের পাখায় নি:শ্বাস রেখে
সে চিরদিনের শেষ প্রান্তে উপনীত হলো।
সে সমস্ত উচ্চারণ হারিয়ে,
গৃহ-সামগ্রী চিহ্নহীন করে,
সূর্যের রূপায়,
অসম্ভব নীলে
ছায়াহীন অনির্ণেয়তায়

www.nagorikpathagar.org

তার চিরদিনের দৃষ্টি বিলিয়ে দিলো।"

মানবজীবন আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বাপ্নিক অথচ স্বপ্নীল দূরান্বয়। বিপুল বসুন্ধরাও আলোর প্রত্যাশায় উন্মুক্ত। সে আলো দিগন্ত রেখার কোন প্রান্ত থেকে বিচ্ছুরিত হবে। সময়ের অতল আকর থেকে সে মণি মুক্তা আহরণ করা, ডুবুরির অসম্ভব বৈভবের সন্ধান সে অন্বেষা তো প্রতিচিহ্নহীন জিজ্ঞাসার অতলান্ততার হীরকখণ্ড। সে জিজ্ঞাসা প্রত্যুষের আলোর ছটায় কিংবা সন্ধ্যার তারার ঝিলমিলি সদৃশ্য। কবি তো বিপুল বিশ্বের বিত্ত-বৈভব, গৃহের সামগ্রীকে চিহ্নহীন করে দিয়ে দৃশ্যহীন 'অনির্ণেয়তায়' অন্তলীন হতে চান। এ অন্তর্লীনতাও যেন জীবনের পরিণতিরই এক অন্তর্ছাপ। কবির দৃষ্টির বলয় পৃথিবীকে দর্শন করা বলয়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত সত্যের মুখোমুখি হতে চান তিনি। Aldows Huxley ও সত্যের সমগ্র সত্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলেছেন। এই সত্যই 'Whole Truth'

"In recent times literature has become more and more acutely conscious of the Whole Truth of the great oceans of irrelevant things events and thoughts stretching endlessly away in every direction from whatever island point (a character, a story) the author may chose to contem plate. In impose the kind of arbitrary limitations. which must be imposed by any one who wans write a tragedy, has become more and more difficult is now inded for those who are at all sensitive to contemporanety, almost impossible. This does not mean, of course that the modern writer must confine himself to a merely naturalistic manner. One can imply the existence of Whole Truth without laboriously cataloguing every object within sight."

[Tragedy and the Whole Truth -Aldous Huxley]

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর কবি সত্তার সমর্পিত পুরুষটিকে 'সূর্যের রূপায়' এবং নিঃসীম নীলিমার অসম্ভব নীলে, বিলিয়ে দিতে চান। মানবজীবনের পূর্ণতায় সমগ্র সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে চান। তাঁর ভেতরকার অন্তর্লীন মানুষ, মনুষ্যত্বের অন্তর্বীজ দিয়ে জীবন বৃক্ষের মহীরূহ রোপায়িত করতে নিরন্তর প্রয়াসী। তিনি তাঁর নিজস্ব

www.nagorikpathagar.org

জীবন ভূখণ্ড আর কাল গর্ভ থেকে উঠে এসে আনন্ত্যের আতিশয্যে কালোত্তীর্ণ হতে চান। সাদামাটা কৃষক বালকের মতো বুনোমোষ চরানোর কাজ তো তাঁর নয়। সমুদ্র তটে ঘুরে ফিরে বালিয়াড়ির ঝাপড়া খেয়ে সাহসী নাবিকের সঙ্গে নুড়ি কুড়ানোর কাজ তার। মানুষের জীবনের সাম্রাজ্য তো ব্যাপ্ত, বিশাল। সেটা কোনো ভূগোলের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়। সেটা কাল কালান্তরের ধারায় চিরপ্রবহমান দূরায়ত দূরকৃত। বিশ্বজগতের তো চিরজাগ্রত নিয়ন্তা আছেন। তিনি সত্য। তিনি চিরন্তর। তিনিই অখণ্ড। তিনিই অদ্বৈত্ত এবং সর্বজ্ঞ। সত্য এবং চূড়ান্ত সত্যই তাঁর মোক্ষ। এই 'মহামোক্ষের' কথাই আলী আহসান বলছেন বারবার। জীবনের পরিণত প্রান্তে এসে তিনি এই সত্যের বেদনায় বেদনার্ত। সত্য কোথায়, সুন্দর কোথায়? এই মহাজিজ্ঞাসায় তিনি ব্যাপৃত এবং নিজেকে বিমথিত করেছেন। বনস্পতির প্রাচীন ডালপালাও বাতাসে বাতাসে, মৃদু হিল্লোলে সতত দোল খায়। মর্মরিত হয়। কিন্তু কেন? এ স্পন্দন, কল্পন স্বনন কেন? এতো জাগর বৃক্ষের জাগরতার স্পন্দন ধ্বনি।

একজন জীবনশিল্পীর মূল উদ্দেশ্য কি? জীবন ও জগতের বাঁককে ঘুরে ঘুরে জীবন এবং জগতকে দেখা জীবনের রূপায়ণ, জগতের নানা সংস্করণের মধ্য দিয়ে এক সংস্কৃত ভবিষ্যতের জন্য মগ্ন থাকা। এই তো শিল্পীর কাজ। তাঁর ভাষা তাকে উদ্ভাবনী শক্তি যোগায়। তার ভাষা তাকে মুক্তি দেয় অমৃতের পথে। 'অমৃতস্যের' সন্তান হিসেবে। কারণ ভাষাই জীবনের সূত্র খুঁজে পায়। গ্রন্থি উন্মোচন করে।

> *"আমার ধারণা, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনা তার ভাষা এবং ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে অক্ষর বা বর্ণমালার উদ্ভাবনের ফলে। ভাষা মানুষকে মুক্তি দেয় নির্দিষ্ট বিশেষ থেকে অফুরন্ত নির্বিশেষে আর সেই নির্বিশেষ থেকেই উদ্ভূত হয় বিকাশ এবং শিল্পকলা। অক্ষরের সূত্রে মানুষ দেশ কালকে জয় করে অমরত্ব অর্জনের চাবিকাঠি খুঁজে পায়। প্রাণী মাত্রেই মৃত্যুর অধীন তবু প্রাণী অমরত্ব খোঁজে সঙ্গম সূত্রে বীজের বপন ব্যক্তি মরে কিন্তু প্রজাতি অনেক ক্ষেত্রেই টিকে থাকে। মানুষ অমরত্বের জন্য নির্ভর করে অন্য প্রাণীর মতো জনন কোষের ওপরে- কিন্তু অন্য প্রাণীদের তুলনায় তার একান্ত স্বকীয় আর একটি চাবিও আছে। পৃথিবী থেকে মনুষ্য সভ্যতার বিলোপ না ঘটা পর্যন্ত সৎ সাহিত্য অমর।"*

www.nagorikpathagar.org

শিবনারায়ণ রায়ের কথায় 'সৎসাহিত্যের' অমরত্বের বাণী বাঙ্ময় হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান সেই সৎ সাহিত্যেরই জনক। তাঁর 'আমার প্রতিদিনের শব্দে' সেই শব্দদ্রুম উচ্চকিত।

"আমার সমস্ত চেতনা যদি
শব্দে তুলে ধরতে পারতাম
জীবনের নৈমিত্তিক আচার
অকুণ্ঠ অভিবাদন'
কখনও রহস্যের অস্পষ্টতা
আবার কখনও সূর্যের তাপ
এবং রাত্রিকাল সমস্ত সুন্দর
গাছের পাতার নিদ্রা
তমসার অবগাহনে যখন
সময়কে গ্রাস করেছে
যখন নিশ্বাসের ছায়া
স্বচ্ছ কাচে কুয়াশা ফেলেছে
তখন আমার ভাষার শরীরে
প্রকাশের যে যন্ত্রণা
তা আমি প্রতিবার কবিতা লিখতে গিয়ে
অনুভব করেছি
তার কেশে সমস্ত আকাশের মেঘ
তার নয়নে চিরকালের নদীর উদ্বেলতা
এবং বাহুতে প্রান্তরের বিস্তীর্ণ আশ্রয়
সে আমার প্রতিদিনের শব্দ।"

তাঁর ভাষার শরীরে প্রকাশের যে যন্ত্রণা-সেই যন্ত্রণার শরীর মুক্তি খোঁজে জীবনের নির্বাহের অধ্যায়ের সূচিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। শিবনারায়ণ রায় চমৎকার করে বলেছেন :

"কয়েক বছর আগে লাইপথ্দিগের একটি মাটির টালিতে উৎকীর্ণ কবিতা পড়ে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলাম। কবিতাটি সম্ভবত ২৩৫৭ খ্রিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

পূর্বাব্দে রচিত। কবির নাম লেখা সেই, বিষয় দেবী ইশতারের বিলাপ, কবিতাটি কিছুতেই ভুলতে পারি না, শেষ পর্যন্ত দুঃসাহসে ভুল করে বাংলায় তার একটা ভাবানুবাদ করি। হয়তো এটিই সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতম কবিতা- প্রায় সাড়ে চার হাজার পেরিয়ে এক অপরিচিত সুমেরীয় কবি এসে হাত ধরেছেন একজন বাঙালি সহৃদয় পাঠকের।"

ঐ অপরিচিত সুমেরীয় কবির একটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"তার ক্লিণ্ন হাত মাখিয়েছে মৃত্যুর আঁধারে
বর্বর বৈরীর মনে মোহের লেশ মাত্র নেই,
বেশবাস কেড়ে নিয়ে সাজিয়েছে সঙ্গিনী শরীর
ছিঁড়ে রত্ন অলঙ্কার পরিয়েছে আপন কন্যাকে।"

আলী আহসান তাঁর হৃদয়ের মর্মর পাথর কুঁদে কুঁদে আবিষ্কার করেন। সেই শব্দমালা থেকে উৎকীর্ণ ভাষার বিভূতি। শব্দের শুদ্ধতার জীবনের সাতত্য নির্মাণ করে চলেছেন তিনি। একজন কবি তার কেউ নন, তিনি রূপকার। শব্দে রূপ প্রদান করেন জীবনের। তার ব্যক্তি অস্তিত্বের স্রষ্টা তিনি। আমি সেই ব্যক্তি অস্তিত্বের বিভূতি ও রূপকাঠামোর কথা বলতে চাই। বিবেকিতা, মনস্বিতা ও নৈতিকতা এ সত্তাগুলো শিল্পীর জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠলে তিনি সর্বজনীন হয়ে ওঠেন। অমরত্বের অভিধা অর্জন করতে থাকেন। একজন কবির জিজ্ঞাসা হবে অন্তহীন। কৌতূহল থাকবে নিগূঢ়। যুক্তি থাকবে অকাট্য। তাঁর বিবিক্ষা, তাঁর নির্মিৎসা হবে অনন্যপূর্ব অনন্যচিন্ত্য অন্বীক্ষায় কবির আত্মা হবে উচ্ছল ও আনন্দিত।

আলী আহসান আমাদের সময়ের এক প্রাজ্ঞ সন্তান। মননে, মনস্বিতায় অনন্য। তাঁর মনস্বিতা বহুদিকস্পর্শী কখনও মৃত্তিকাগামী কখনও অন্তরিক্ষযাত্রী। এ দুইয়ের মেলবন্ধে তার শিল্পীসত্তা সংস্থিত। সৈয়দ আলী আহসানের জীবনে একাকিত্ব আছে। নৈঃসঙ্গ আছে। নিবিড় নির্জনতাও আছে। তাঁর বেদনা বিধুরতার মধ্যেও এক ধরনের বিভাব আছে। এ বিভার তাঁর সমস্ত জীবনের ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য অকৃত্রিম স্বস্তির এবং এবং ধ্রুবপদ প্রশান্তির। কবির বিবেকিতা ও নৈতিকতা তার বিশ্বাসের প্রপঞ্চ রচনা করে। সে অনন্ত বিস্তার অনেক অন্ধকার চূড়া বিদীর্ণ করে ছুটে যায়। 'অনেক আকাশ' জুড়ে যে কবি ভ্রাম্যমাণ তাঁর অভিযাত্রিকতা বহুদূরগামী।

www.nagorikpathagar.org

মরতা নিয়েই মরতাকে জয় করে নেয়া

'THYSELF VINDICATE THYSELF'

—SENECA

সে চার দশক কাল আগের কথা।

ষাটের দশকের ছাত্ররাজনীতির ঊষামুহূর্তেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ঊষার আলোকরশ্মিগুলো ধীরে ধীরে আমার যাত্রাপথ রেখায়িত করতে থাকে। সে অগ্নিরথে চেপে আমি অগ্নিবলয়ের দিকে যাত্রা করতে থাকি। সেদিন হয়তো অতটা জানতাম না, কিংবা বুঝতে পারতাম না কতদূর পর্যন্ত হবে আমাদের পথযাত্রার পথ। কত দূরগামী হতে পারব আমরা। কিন্তু আমরা যে সুদূরের যাত্রী, এ বিশ্বাসে ছিলাম অটল। ষাটের দশক ছিল আন্দোলন আর সংগ্রামের কাল। আগুনের বারুদে ভরা দিনগুলোর স্মারক। যেখানে আগুন আছে, সেই বহ্নিশিখা থেকেই জ্বলে আলোর প্রদীপ্ত শিখা-প্রশিখারা। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সলতেটি জ্বলে ওঠে যাদের হাতে-সেই অগ্নিসারথিদের অন্যতম প্রধান পুরুষ, শেখ ফজলুল হক মণি।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি। ছাত্রলীগের ঐ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন অনলবর্ষী বাগ্মী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে তারা ঘুরে বেড়িয়েছেন ছাত্রলীগের পতাকাটি হাতে করে, যে পতাকার পটে উৎকীর্ণ ছিল আগুনের শিখা। আর সমুদ্রের গতিশীল তরঙ্গমালা। ঐ পতাকা হাতে আমরা এক আগ্নেয় অনুভূতি ও আবেগে সারা বাংলাদেশে বিচরণ করেছি মহাকাপালিকের মতো আমরা কি চেয়েছিলাম সেদিন? আমাদের চোখের পাতায় পাতায় স্বপ্নপুরীগুলো সবুজ উদ্ভিদের মতো লতিয়ে উঠেছিল। সেই স্বপ্নপুরীটি কি? বাংলা ও বাংলার মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমাদের সামনে সে পতাকাটি উত্তোলন করেছিলেন ইতিহাসের আগ্নেয়পুরুষ শেখ ফজলুল হক মণি। আমাদের আত্মার অন্তর্ভুক্ত সেই মানুষটি আমাদের মণি ভাই।

শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে তিনি ছিলেন সম্যক পরিচিত। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলার মানুষ ও বাঙালির সংস্কৃতির

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ ঘনিষ্ঠতা ও সংশ্লিষ্টতা তাঁর জীবনকে করে তুলেছিল বাংলা ভাষা এবং বাঙালি অর্থাৎ বাংলার জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম, ওতপ্রোত।

আমরা এদেশের, প্রধানত: ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলনের ধারায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটতে দেখি। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধমনীর রক্ত প্রবাহে যে বীজ-কণা অঙ্কুরিত হতে থাকে- এরই ফলশ্রুতি থেকে মঞ্জুরিত পল্লবিত হয়ে ওঠে আমাদের জাতিসত্তার এক মহা মহীরূহ। এই জাতিসত্তার মহা মহীরূহের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে সেদিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বাংলাদেশে বাঙালির মানস প্রান্তরে বপন করে যেতে থাকে বাঙালির 'মহাজাতিকে জীবন সত্তার রক্ত বীজকণা'। এ জাতীয় জীবন সত্তার আন্দোলনে শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন অন্যতম পুরোধা পুরুষ। বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের মহান জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম-ইতিহাসের নানা ধাপ, বাঁক, মোড় পর্যায় পেরিয়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং সবশেষে এক যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক পরিণতির মাত্রা অর্জন করে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কাছে এজন্য বারবার ফিরে যেতে হবে। কারণ এ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে পুনঃনির্মাণ করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

আমাদের এ মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান ও ভারতের ঐতিহ্য ধারার বিপরীত এক 'জেনেসিস'-এর জন্ম দিয়েছে। আমাদের এ 'স্বাধীন' ও 'সার্বভৌম' রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্ত থেকে এ 'জেনেসিসটি' অবিচ্ছিন্ন, অবিভাজ্য হয়ে থাকবে আমাদের জাতিসত্তার সঙ্গে। চিরকাল, শাশ্বতকাল। শেখ ফজলুল হক মণি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ইতিবাচক পুরুষ। আমরা তো প্রথমত জীবনের স্বাভাবিক ধারায় এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থেকে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিলাম। আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিটাকে কেবল দাবিনামা হিসেবেই স্বাক্ষরিত করিনি বরং শেষঅবধি স্বায়ত্তশাসনের বৃত্তবলয় ভেঙে স্বাধীনতার রক্তকীর্ণ কমল-কুঁড়িটিকে মঞ্জুরিত করতে চেয়েছি। এই বীজপত্রের মহান উত্তরাধিকার বহন করেছিল শেখ ফজলুল হক মণি। শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে থেকে আমরা পেয়েছিলাম নতুন পথের আলোশিখা ও জ্বলন্ত দিক-দিশা। শেখ ফজলুল হক মণির আন্দোলন ও সংগ্রামের নির্দেশনা ছিল যুক্তিপূর্ণ ও দুঃসাহসী। তিনি যুদ্ধের স্ট্রাটেজিশিয়ান হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন খুবই পারঙ্গম। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির নির্দেশনাও ছিলো স্বচ্ছ স্পষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই প্রত্যাখ্যান করলেন পাকিস্তান উপনিবেশবাদী আনুগত্য-এর বিপরীতে সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে করলেন ত্বরান্বিত। পাকিস্তানের কাছে বাঙালি জাতির কোনো অধস্তন চেতনাকে তিনি কখনো বরদাস্ত করতে পারেননি। কারণ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বরাবরই ছিল ঔপনিবেশিক আদলে গড়া এবং সে কারণেই পাকিস্তান প্রাপ্তির পর থেকে পাকিস্তানের পতন পর্যন্ত বাঙালি জাতীয় চেতনার কুঁড়িটিকে কন্টকাকীর্ণ করার সর্বতো প্রয়াস ছিল। বিশ্ব সংস্কৃতির দোরগোড়ায় বাঙালি সংস্কৃতির বাতাস তিনি বইয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি বলব শেখ ফজলুল হক মণি তার সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা এবং বিশ্ববীক্ষ ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী সমাজবিজ্ঞানীর মতো কাজ করে গেছেন।

শেখ ফজলুল হক মণি ইতিহাসের, সাহিত্যের শিল্পের এক নিমগ্ন পাঠক। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বহু বছর তার সঙ্গে রাজবন্দি ছিলাম। তিনি রাত জাগতেন অনেক, ঘুমোতেন খুবই কম, আবার খুব প্রত্যুষে উঠতেন। রাতের মধ্যপ্রহর থেকে তিনি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করতেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। তার স্মৃতিশক্তি ছিল ভীষণ প্রখর, উজ্জ্বল। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুহার ভেতর বসে তিনি পৃথিবীর অনেক কিছুই পাঠ করেছেন। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত করেছিলেন নিজেকে। সকালে ঘুম থেকে জেগেই চটজলদি নাশতাটা সেরে নিতেন, তারপর জেলখানার আবার সুদীর্ঘ প্রশস্ত এক দুই খাদায় তার বেডসাইডের জানালা ধরে বসে আকাশের দিকে তাকাতেন, পাতাবাহারের ঝাড়ের দিকে তাকাতেন। খানিক পর তাসও পেটাতেন। বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত একটানা কয়েক বছর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ ছিলাম। ঐ সময়ে আরো যারা কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁরা হলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়জ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খান, আসমত আলী সিকদার, সওগাতুল আলম সগীর, রবিউল আলম, আব্দুর রাজ্জাক, শহীদুল হক মুন্সী, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান, রুহুল আমি ভূঁইয়া, পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমদ, বদরুল হক, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আউয়ুব রেজা চৌধুরী প্রমুখ। বিকেলে ঐ ওয়ার্ডের মাঠে নেমে আমরা ভলিবলও

www.nagorikpathagar.org

খেলতাম। মণি ভাই ছিলেন খুব তুখোড় লিফটার। কারারুদ্ধ অবস্থায় আমাদের হৃদয়ের ও মননের ব্যথায় আমরা ছিলাম রক্তাক্ত। কিন্তু ভলিবল খেলতে গিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলো কতবার যে ব্যথায় জর্জরিত হয়েছে এবং বিক্ষত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

মণি ভাই ঐ কারাগারে বসেই রচনা করেছিলেন একটি উপন্যাস। তার উপন্যাসের নায়িকা ছিল রোমান্টিক ও রেভ্যুলেশনারি। তিনি ছিলেন ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। তাই তার উপন্যাসটি হয়েছিল বেশ প্রাণবন্ত ও দ্বন্দ্বমুখর।

এ কথাটা আগে বলা হয়নি, ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি মারাত্মক প্যান্ডামোনিয়ামের সৃষ্টি হয়। তদানীন্তন গভর্নর আব্দুল মোনেম খানের কাছ থেকে কেউ যাতে কনভোকেশনের ডিগ্রি গ্রহণ করতে না পারে তারই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি ও আসমত আলী শিকদার। এর ফলে এরা উভয়েই রাষ্ট্রেরোষের শিকার হন। তাদের ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়, এক্সপেলড করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়। এই প্রতিবাদী পুরুষ প্রবর আজ আর আমাদের মঞ্চে নেই। আমাদের ইতিহাসের পাতায় তার অভিযাত্রিকতা অসম অতুলনীয় এবং অনন্যপূর্ব। ইংরেজিতে একটি কথা আছে। 'fortune favours the bold' আমরা জানি ইতিহাসের পালাও লেখা হয় সৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার শব্দবন্ধে।

শেখ ফজলুল হক মণি আমাদের ইতিহাসের এক মহান অভিযাত্রিক। আমি তার অভিযাত্রিকতাকে স্মরণ করি ঐকান্তিকতায়।

www.nagorikpathagar.org

সুহৃদয় সহৃদয় ইলিয়াস

ইলিয়াস জীবনের ভেতর জীবন অনুসন্ধান করেছেন অনর্গল। মৃত্যু অবধি তাঁর এই অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল। তাঁর মৃত্যুও যেন আরেক অলৌকিক পরিণতি। ষাটের অগ্নিক্ষরা দশকে তিনি আবির্ভূত হলেন। প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্যে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তেমনি অফুরন্ত নয়।

সুহৃদয় সহৃদয় ইলিয়াস আমার বন্ধু। ইলিয়াসের কে এম দাস লেনের বাসায় অনেকবার গিয়েছি। কখনো কখনো আমার আরেক অবিচ্ছেদ্য বন্ধু হাসান সালাহউদ্দীনকে সাথে করে। সন্ধ্যায় যখনই গিয়েছি, পেয়েছি তাকে। খুব কমই এমনটা ঘটেছে যে তাকে পাইনি। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইলিয়াস থাকতেন আগামসিহ লেনে। ওখানেও মুহাম্মদ আখতার, রফিক আজাদ আরও অনেকে একসাথে অনবদ্য আড্ডা দিয়েছি। ইলিয়াস ছিলেন বন্ধুবৎসল। ইলিয়াসের ইন্তেকালের কিছুকাল আগে বন্ধু টগরকে (হাসান সালাউদ্দিন) নিয়ে কে এম দাস লেনের বাসায় গিয়েছিলাম। সেদিন সুরাইয়া ভাবী বাসায়ই ছিলেন। তার আদর-আপ্যায়নের অবধি ছিল না কোনো। ঐ কে এম দাস লেনের বাড়িটার আঙিনা ছিল গাছ-গাছালি, হরিৎ গুল্মলতায় ঘেরা। পুরনো বাড়িটার আকর্ষণ ছিল আমার কাছে বড় বেশি। ইলিয়াস ও সুরাইয়া ভাবীর শ্যামল আত্মীয়তা মুগ্ধ করত আমাকে। বার বার আমাকে ডাকত। আমি যেতাম সেখানে। স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ত বোধ করতাম। আমিও এই এলাকার বাসিন্দা দীর্ঘদিনের। গোপীবাগেই কাটিয়ে দিলাম প্রায় দুই যুগ। মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে কথাশিল্পী শওকত আলীকে কতবার এগিয়ে এসেছি তার বাসা পর্যন্ত। তারপর শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিশাল বাড়ির আঙিনার চত্বর দেখতে দেখতে কত গুল্মলতার ঝাড় পাড়ি দিয়ে ইলিয়াসের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছি নিজের বাসায়। এর কোনো ইয়ত্তা নেই যেন। ইলিয়াসের বাসা মানে ইলিয়াসের একান্ত নিজ বাসভূমি। এটা তার নিজের বাড়ি কিংবা পৈতৃক ভিটে-মাটি নয়। তবু নিজের হাতেই যেন করা, নিজের হাতেই গড়া। ভোর শুরু হতে না হতেই পাখির কূজন। প্রাণ খুলে ডাকাডাকি। সন্ধ্যা নাগাদ। রাতেও গাছের পাতা কাঁপিয়ে, বৃন্ত শাখা নাড়িয়ে কোনো কোনো পাখি ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করে। কেন

www.nagorikpathagar.org

করে? কার জন্যই বা করে, কে জানে? সুরাইয়া ভাবী একদিন বললেন, নিশুতি রাতেও পাখি ডাকে, ভাই। আমি বলেছিলাম। হ্যাঁ ভাবী, জীবনের প্রয়োজনেই হয়তো ডাকে। ইলিয়াস আর এখন ওখানে নেই। অন্য কোনোখানে অন্য কোনো আনন্দলোকে। মঙ্গললোকে আমি আর ঐ কে এম দাস লেন ধরে কোথাও যাই না। জীবনঘাতী এক দুরারোগ্য মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে ইলিয়াস কোনেভাবেই রেহাই পেলেন না। জীবনটা কেড়ে নিয়ে গেল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত ঘাতকে সহ্য করেও ইলিয়াস বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঁচতে পারলেন না তিনি। এখানেই আমাদের দুঃখ রয়ে গেল অনিঃশেষ। ইলিয়াস আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারতেন আমাদের সাথে। তাঁর প্রিয় পরিবার-পরিজনদের সাথে। আমাদের রৌদ্র ছায়াময়, ধূলিধূসর মায়ার সংসারে। ইলিয়াস আপনি এত মায়া কাটাতে পারলেন কি করে? ইলিয়াস আপনি মানুষকে ভালোবাসতেন। নদীর বয়ে যাওয়া দিগন্ত ভালোবাসতেন। এইসব ঐশ্বর্য ফেলে রেখে আপনি কোথায় চলে গেলেন। আপনার দেয়া সৃষ্টি ও ঐশ্বর্য আমাদের মধ্যে রয়ে গেল।

> "যে কোন মানের বা যে কোন প্রকৃতির বা যে কোন
> স্বভাবের শিল্পী মানুষের সঙ্কট দেখতে দেখতে তার
> নিরন্তর সংগ্রামের নিয়মটির অনুসন্ধান করেন। এই
> অনুসন্ধানই তার কাজ এবং এই কাজের বেতন হলো
> অনুসন্ধান স্পৃহা। অনুসন্ধানের শক্তিকে অনুভব
> করাই তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।"

ইলিয়াস জীবনের ভেতর জীবন অনুসন্ধান করেছেন অনর্গল। মৃত্যু অবধি তাঁর এই অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল। তাঁর মৃত্যুও যেন আরেক অলৌকিক পরিণতি। ষাটের অগ্নিক্ষরা দশকে তিনি আবির্ভূত হলেন। প্রচণ্ড প্রাণ প্রাচুর্যে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তেমনি অফুরন্ত নয়। একেবারে অঙ্গুলিময় বটে। ইলিয়াস কালের ওপারে চলে গেছেন মাত্র ক'একখানা রচনা রেখে। কিন্তু তার স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে বসে তিনি তার পূর্ণব্যবহার করে নবতর সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলতে পেরেছিলাম। এত অল্প পরিমাণ সৃষ্টির জন্য আমাদের আফসোস করার কোনো কারণ নেই। তার সৃষ্টির পরতে পরতে জীবন ও যুগের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

নানা বাঁক ও মোড় ভেঙে, ইলিয়াস জীবনের নতুন প্রবাহের নির্ঝরিনী বইয়ে দিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, মানুষের 'racial memory' কখনো ধ্বংস হয়ে যায় না, কিংবা যাওয়াটা সমীচীনও নয়। অতীতকে জীবন্ত করে আবার স্মৃতির দরোজার সামনে দাঁড় করানোর কাজটা ইলিয়াস খুব নিপুণ শিল্পীর মতোই করতে সমর্থ হয়েছেন। দূরগামী জীবন স্বপ্ন নিয়ে কালের ভেলায় ভেসে যেতে যেতে এক অন্বিষ্টলোকে গিয়ে পৌঁছলেন। জীবন পাড়ি দিতে গিয়ে যে পারাপারে চেপে বসেছিলেন, সেটা তো তার ব্যক্তির বিলাস ছিল না। ছিল তার হৃদয় চুল্লির ভেতরকার গনগনে আগুনের বিশ্বাস, বিপন্নতা ও সময়ের বিষণ্নতা বোধের এক অন্তহীন লাভা। ইলিয়াস তাঁর সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতির সাধক হতে চেয়েছিলেন এবং পেরেও ছিলেন পুরোপুরিই।

"দেশের কি জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না গিয়ে
যদি নিজের আর বন্ধুদের আর আত্মীয়-স্বজনের
স্যাঁতসেঁতে দুঃখ বেদনাকেই লালন করি তো তাতে
হয়তো মধ্যবিত্ত কি উচ্চবিত্তে সাময়িক উত্তেজনা
সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা থেকে তারা নিজেদের জীবন
যাপনে যেমন কোনো অস্বস্তি বোধ করবে না,
তেমনিই পাবে না কোনো প্রেরণাও।"

গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে এবং কৃচিৎ আত্মজৈবনিক রচনায় ইলিয়াস সময়ের পটভূমি থেকে জীবনের মুহূর্তগুলোকে বেছে নিয়েছেন- জীবন সত্যকে যুগের সত্যে পরিণত করতে চেয়েছেন কিংবা আগামী দিনের সত্যের আভাস দিয়ে যেতে চেয়েছেন।

আমরা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যে দেখেছি, 'প্রবৃত্তিই যেন মানুষের নিয়তি' এই প্রবৃত্তি মানুষকে ধাবিত করে, চালিত করে জীবনের আঁকাবাঁকা পথের সীমানায়। মানুষের নিয়তিও যেন অমোঘ, অনিবার্য ধারাক্রম। অমোঘ নিয়তির ঘেরা টোপ ডিঙিয়ে মানুষ যখনই যেদিকে যেতে চায়-সেখানেই সে বাঁধা পড়ে যায় সাতপাঁকে। ইলিয়াস এই অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণতিকে বার বার পরখ করে দেখেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলো ফেলে। কিন্তু কোথায় যেন রয়ে গেছে অমোঘ নিয়তির অলঙ্ঘনীয় এক শেকল। যে শেকল ভাঙা যায় না। ছেঁড়া যায় না ঐ শেকলের লৌহ

www.nagorikpathagar.org

বন্ধন। এ জন্যই বুঝি মানুষ বার বার অসহায় হয়ে নিয়তির হাতে ধরা দিয়েছে। ইলিয়াস এই নিয়তি লঙ্ঘনের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গল্প ও উপন্যাসে কথাশিল্প কি? আর কথাশিল্পীই বা কে? মানব জীবনের নিপুণ অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষা-দুঃখ ও বেদনা, যন্ত্রণা ও আনন্দ-স্বস্তি-বিষাদ, অর্থাৎ জীবনের সূচনাপর্ব থেকে ক্রমবিকাশ, অবক্ষয়-ক্ষয় থেকে পৌর্বাপূর্বিক বিস্তার ও পরিণতির শিল্পই কথাশিল্প। যিনি এই শিল্পের স্রষ্টা-তিনিই কথাশিল্পী।

আধুনিককালে কথাশিল্পের প্রধান দু'টি ভাগ রয়েছে। উপন্যাস ও ছোটগল্প। ছোটগল্প থাকে সঙ্কেতের আভাসের বিচিত্র দেয়াল আর সোনালি দরজা-জানালার অবস্থান। উপন্যাসে থাকে জীবন রসায়নের প্রতি অণুকণা, খণ্ড, অখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ ভগ্নাংশ এবং সমগ্রের সর্বভূতি। ছোটগল্পে জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত 'ক্রাইসেশন'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। এটা যেন বিদ্যুৎ চমক জীবনের। একটি নিমেষ, একটি পলক ফল্গুধারার প্রবাহের মতো বয়ে যেতে থাকে। কিন্তু উপন্যাসে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি নানা তরঙ্গ বিভঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সৈকতের অসংখ্য বালুকারাশি গড়িয়ে গড়িয়ে মোহনায় গিয়ে মিশে। উপন্যাসে জীবনের বিস্তীর্ণতা, বিশালতা বিধৃত বিম্বিত হয়। জীবন সর্বাংশে সত্য হয়ে ওঠার জন্য কেবলই ব্যাকুল, আকুল, অস্থিতিবন্ত হতে থাকে। প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে সর্বাংশে সত্য হয়ে উঠতে চায় জীবন। সমাজের বিস্তীর্ণ মানসমঞ্চে বসে একজন কথাশিল্পী এ পৃথিবীর ঐকতানে জীবনের ভেতর জীবন যোগ করতে চান। জীবন বিভূতির আলোক ঐশ্বর্য স্বীকরণ করতে চান।

বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র-পরবর্তী শিল্পীরা ধীরে ধীরে সমাজ মঞ্চের উচ্চমার্গ থেকে নেমে এসেছেন একেবারে মানবজমিনে। ধূলি ধূসর গণভূমিতে। গণমানবের পথে পথে স্তূপীকৃত জঞ্জালের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন নিবিষ্ট হৃদয়ে। বোধি ও বিবেককে একই জীবন মোহনায় টেনে নিয়ে মিশিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আধুনিককালের আর্তি বেদনাকে আরও অগ্নিকান্ত করে তুলতে চেয়েছেন। আধুনিককালে কেবল বসবাস করলেই মানুষ আধুনিক হয়ে পড়ে না। আধুনিক সময়ের মুহূর্তের সমস্ত স্বভাবকে আত্মস্থ করতে না পারলে আধুনিকতার কোনো আস্বাদ কেউ গ্রহণ করতে পারে না। কোনো শিল্পীর পক্ষেও সেটা সম্ভব নয়।

আঙ্গিক আবহ এবং অভিজ্ঞতা থেকে জীবন সচেতনতাকে মূর্ত করে তোলাটাই

www.nagorikpathagar.org

ঔপন্যাসিকের কাজ। ঔপন্যাসিকের একমাত্র কাজ বাস্তবতাকে জীবনের দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ করা। লটকিয়ে দিয়ে দিতে হয় সময়ের সদা সতর্ক ঘুন্টিটা। কালের সান্ত্রী সেটা বাজিয়ে যেতে থাকবে নিমিষে। বাস্তবতার বহিরঙ্গ এবং অন্তর্পীড়ন উভয়ই থাকবে উপন্যাসিকের অনুসন্ধিৎসায়। Hopscotch উপন্যাসে লেখক হুলিয়ো কোর্তাসার বলেছেন : "The writer has to set language on fire put am and to its coagulated from and even go beyond it..." আমরা লক্ষ করে থাকব 'প্রসঙ্গ' এবং 'আঙ্গিক' আধুনিকতার বড় রকমের শর্ত ও সত্য। সময়ের মুহূর্তের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কেবলি নিরন্তর হয়ে উঠতে থাকার ভেতরে আধুনিকতার বীজকণা ছড়িয়ে পড়ে। আত্মতৃপ্তির পিষ্টনে জীবনের অমোঘ আকুতি ও আর্তি উসকে ওঠে। এই উসকে ওঠা কিংবা উসকে দেয়ার কাজটি করে যেতে হয় শিল্পীকে উপন্যাসকারকে। সমাজকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে- ঐ সমাজ ভেতরে উপরেই আবার নতুন ইট সুরকির কাজটি করতে হয় একজন আধুনিক শিল্পীকে। এই ভাঙনের কাজ অবশ্য ক্রিয়াশীল থাকবে। কিন্তু তাই বলে আধুনিকতা কোনো ঐতিহ্যবিচ্যুত উন্নাসিকতাও হতে পারে না।

"Be contemporary provided be original contemporimity never means separation from the roots."

ব্যক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়ে। আবার ব্যক্তি যেমন পরিবারের উৎস। পরিবারও সমাজের নাভিমূল। ব্যক্তি পরিবারকেও সংগঠিত করে। সমন্বিত করে। সমৃদ্ধ করে। পরিবারে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রধান। ব্যক্তির বিকাশ ছাড়া সমাজের বিকাশ নেই। যে সমাজে ব্যক্তির প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্বস্তি-অস্বস্তি, ইচ্ছা-অনীহা, স্থৈর্য, জঙ্ঘমতা, বেঁচে থাকা জীবন যুদ্ধ ও সমগ্র সংগ্রাম- সে সমাজের সমন্বয়ের বিকাশ ঘটে না। ঘটে না মুক্তি। প্রফুল্ল কুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পাঠ করা বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

> "উপন্যাস বড় হয়েছে ব্যক্তির বিকাশ ঘটতে ঘটতে। আবার ব্যক্তির বিকাশ ঘটতেও উপন্যাসের ভূমিকা কম নয়।....দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ আবার স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তি আমাদের চোখে পড়ে না। এজন্য শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে যখন লিখি তখনো

www.nagorikpathagar.org

পাকে-প্রকারে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেই মধ্যবিত্তকে এবং শক্ত, সমর্থ, জীবন্ত মানুষগুলোকে পানসে এবং রক্তশূন্য করে তৈরি করি। ...ফলে আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদ চলে যাচ্ছে আমাদের চোখের আড়ালে। আমাদের উপন্যাস দিন দিন রক্তহীন হয়ে পড়েছে। এই কাহিনী নানান বয়ানে শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত। তবে ক্লান্তিও লেখকরা লুফে নেন। জীবনে একেই সত্য বলে জাহির করার সুযোগ খোঁজেন।"

এই যে ব্যক্তির বিকাশ-সমাজ বিকাশের দিকে ধাবিত-এই ব্যক্তি ও সমাজের প্রবহমানতাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানবজীবনের সমুদ্রের সহস্র প্রসঙ্গে স্বাক্ষরিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর নিজ জীবনের বিশ্বস্ততা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে। মানবজীবনকে আপসহীন সংগ্রামের রক্তকীর্ণ রাজপথেই বিজয়ী করে তুলতে ইলিয়াস এক আগ্নেয় অঙ্গীকারে বিস্ফারিত। জীবনের স্বপ্ন ও অস্তিত্বকে তার আত্মশক্তির মহিমায় অভিষিক্ত করতে ব্যাপৃত ছিলেন নিরন্তর। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বর্তমানের বৃত্তের বন্দি বাসিন্দা নন। আগামীর অনন্য ঐশ্বর্য এবং চিরায়ত বৈভব সন্ধানী আলোক সামান্য পুরুষ। কষ্টিপাথরে পরোখকৃত এক খাঁটি স্বর্ণমূর্তি। তার ভেতরে কোনো খাদ নেই। নিখাদ, অকৃত্রিম। ইলিয়াসের যাত্রা জীবনকে নিয়ে ক্রমাগত জীবনের দিকে। পাঠককে জীবনের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সচেতন করেন। তিনি নিজে এতটা সচেতন ফলে এই সচেতনতা জাগ্রত করতে চান। ইলিয়াস 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' প্রকাশ করে আমাদের জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন-তার অবস্থান অন্যতম আর কণ্ঠস্বর অনন্য। আমাদের কথাসাহিত্যের সুপদ প্রান্তরে তিনি ফলিয়েছেন একেবারেই অন্য স্বর্ণবন্ত শস্য, কণ্ঠে বেঁধেছেন 'অন্য বন্দিশে'। আমাদের কথাসাহিত্যের অনন্যতা চিহ্নিত সার্থক শিল্পী তিনি।

শিল্প সাহিত্যে 'জনপ্রিয়তা' একটি ব্যাপার রয়ে গেছে। জনপ্রিয়তার সেই মাপকাঠিতে বা নিরিখে শিল্পের বিচার হয় না কোনোদিনই। শিল্পের বিচার হয় শিল্পের বৈদগ্ধে নিগূঢ় বিভাব-বৈভবে। ইলিয়াস কোনো অর্থেই জনপ্রিয় নন। কিংবা সেটা করাও সম্ভবপর নয়। 'জনপ্রিয় হয়ে যাওয়া' লেখকের তেমন কোনো দায় থাকে না। 'দায়' বড় দারুণ সত্তা এবং মানব জীবনের। এই 'দায়টাকে' কেউ কেউ এড়াতে পারে না।

একজন মানুষের জীবন পরিধিই বা কতটুকু? এই সংক্ষিপ্ত জীবন পরিসরে তাঁকে বাঁচার জন্য নিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়। নির্মাণ করতে হয় নিজের অবস্থা। শক্তি

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে স্থাপন করতে হয় অস্তিত্ব। সন্তান-সন্ততি, সংসার এর পরও থাকে একটি বিরাট সমাজের বক্রনেমি। এই সমাজের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে কাটিয়ে দিতে হয় তার জীবনের সময়টুকু। এই স্বাভাবিকতা অস্বীকার করে তো জীবন এগোয় না। এই বাস্তববোধে সচেতন হয়ে ওঠার পর একজন শিল্পী নির্মাণ করে যেতে থাকেন তাঁর সৃষ্টিশীল সংসারের হাজার দুয়ার ঘর। যে ঘরের জানালা-দরোজা-কপাট মরদন তাঁকে একজন মিস্ত্রির মতো নিজ হাতেই করতে হয়। এই সৃষ্টিই তাঁর সম্পদ, ঐশ্বর্য, বৈভব। 'অন্য ঘরে অন্যস্বর', 'খোয়াড়ি', 'দুধ ভাতে উৎপাত', 'দোজখের ওম', 'চিলেকোঠার সেপাই' এবং 'খোয়াবনামা' এই তার সৃষ্টি। এই তার বৈভব বিভাব। এই সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা রেখে গেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আর আমাদের কাল-ই বোধ করি তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

একজন লেখক ক'টা বই লিখলেন সেটা বড় কথা নয়- আসলে কি লিখলেন, কতখানি লিখলেন, কিভাবে লিখলেন সেটাই বড় কথা! ইলিয়াসের গল্প সংকলন মাত্র ৪টি। উপন্যাস ২টি। এ নিয়েই তাঁর জীবনগাথা। সংখ্যার দিক থেকে খুবই সংকীর্ণ পরিসর। কিন্তু শিল্পের মানদণ্ডে স্বর্ণচুম্বী। গল্প লিখতে লিখতেই যে ইলিয়াস উপন্যাস লিখে ফেললেন-এমনটা নয়। উপন্যাসে হাত দেবার প্রস্তুতি তার দীর্ঘকালের। এজন্যই তাঁর দু'টি উপন্যাসই কালবাহিত হবার নিয়তি অর্জন করেছে। চিলেকোঠার সেপাই কিংবা খোয়াবনামা দুটো উপন্যাসই এক কালস্তম্ভের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে পাঠকদের মনে ও মননে। আমি আজ এখানে তার গল্প কিংবা চিলেকোঠার সেপাই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব না। খোয়াবনামা নিয়ে আমি কিছু কথা বলব। জীবনে যে গল্প থাকে, গল্প যে জীবন উদ্ভাসিত করে-ইলিয়াসের উপন্যাসেও সেই গল্পের সংস্থিতি, সংবৃত্তি পরিব্যাপ্তি-গল্পের ইলিয়াস এবং উপন্যাসের ইলিয়াসের মধ্যে সেই তফাৎ বা ভেদরেখাটা টানা যায় না কোনো অবস্থাতেই। ইলিয়াসের গল্পের ভুবন আর উপন্যাসের জমিনে একই মানুষ তার একই মানবিক শস্যপুঞ্জ। ইলিয়াসের ভাষা ভূমি পেতে শুরু করে তাঁর জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই। তাঁর ভাষা আত্মানিষ্ঠ, ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি সমাজনিষ্ঠ। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া একজন শিল্পীর পক্ষে একান্ত জরুরি। এই অনিবার্যতা, এই অমোঘতা একজন শিল্পীর কাছে তার সমাজ, সময় ও কাল দাবি করে।

'খোয়াবনামার' ভাষায় সেই শৈলীর স্বাক্ষর ও চালচিত্র লক্ষ করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতটা পরে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচ হাত দুটো নাড়ছিল, ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার। অনেকদিন আগে তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপের জন্ম হয়নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরই তখনও দুনিয়ায় আসতে ঢের দেরি, বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ নাকি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয়নি, হলেও বন কেটে বসত করা-বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐসব দিনের এক বিকাল বেলা মজনু শাহের বেশুমার ফকিরের সাথে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্য করতোয়ার দিকে ছোটার সময় মুনসি বরকতুল্লাহ শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিল ঘোড়া থেকে। বন্দুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ান শেকল আর ছাইভস্ম মাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসল কাৎলাহার বিলের উত্তর সিখানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিলজুড়ে, আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাদের যদি একনজর দেখা যায়-এই আশা তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়।

তা না হয় হলো, কিন্তু এখন থেকে দুই বছর সোয়া দুই বছর পর নাকি আড়াই তিন বছরই হবে, বিলের পানি মুছতে মুছতে জেগে ওঠা ডাঙার এক কোণে চোরাবালিতে ডুবে মরলে তমিজের বাপটা উঠবে কোথায়। তাকে ঠাঁই দেবে কে। বড় বানের ছোবলে বড় বড় কাঁঠালগাছ তো সব সাফ হয়ে গেছে মেলা আগে, শরাফত মণ্ডলের বেটা ইটখোলা করলে বাকি গাছগুলোও সব যাবে ভাটার পেটে। তখন? তখন তমিজের বাপ উঠবে কোথায়। দিনে দিনে বিল শুকায়, শুকনা জমিতে চাষবাস হয় জমির ধার ঘেঁষে মানুষ ঘর তোলে। বড় বিরিক্ষিকে জায়গা দেয়ার মতো জায়গা তখন কি আর পাওয়া যাবে?

দিনের বেলা হলে ভালো করে দেখা যায়-বিলের পশ্চিমে বিলের তীর থেকে এদিকে খালপাড় পর্যন্ত জায়গাটা এখন পর্যন্ত খালিই পড়ে রয়েছে। তারপরই মাঝিপাড়া। মাঝিপাড়ার মানুষ অবশ্য নিজেদের গ্রামকে ওভাবে ডাকে না, গোটা গ্রামজুড়ে তো আগে তাদেরই বসবাস ছিল। এখন পাঁচআনা ছয়আনা বাসিন্দাই চাষা। আগে কয়েক

www.nagorikpathagar.org

ঘর কলু ছিল, আধ মাইল পশ্চিমে টাউনে তবিবর মুক্তারের 'রহমান অয়েল মিল' হওয়ার তিন বছরের মধ্যে কলুদের অর্ধেকের বেশি চলে গেল পুবে যমুনার ধারে। যে কয় ঘর আছে তাদের কারও কারও ঝোঁক জমিতে আবাদ করার দিকেই বেশি।

খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো ভেসে ভেসে ভেঙে ভেঙে বিপুল বারিধারার মতো ঝরে পড়ে ইলিয়াসের ভাষার শব্দ প্রপাত। কখনও সরোবরের মতো শান্ত জলকণা। আবার কখনও যেন সমুদ্রের চলোর্মি। অস্থির তরঙ্গমালা। কখনও 'রজনী জাগর ক্লান্ত'- কখনও চৈতন্যজাগর। ইলিয়াস জাগরীর মতো প্রাত্যহিক স্বভাব অর্জন করেছেন। ইলিয়াসের সৃষ্টির সাথে যারা সম্পৃক্ত হতে থাকবে তারা জীবনের গভীর অতল প্রদেশে প্রতি মুহূর্ত প্রবেশ করতে থাকবে। এটা আমি বেশ ভালোভাবেই জানি ইলিয়াস ব্যক্তিস্বভাবে কিংবা শিল্পীস্বভাবে কোনো পাঠক স্পর্শকাতর মানুষ নন কখনোই। শিল্পই তাঁর স্বভাবে বড় বিষয়। পাঠক মুখ্য নয়। পাঠককে পরোয়া করেন তিনি-তবে সচেতন-সংস্কৃত পাঠককে। অমনোযোগী কাউকেই নয়। এটা সেন্ট পার্সেন্টই বলা যায়। সিরিয়াস সব পাঠকই তাঁর সবিনয় মনোযোগ কাড়ে। ইলিয়াসের ভাষার মধ্যে একটা জাদুর কাঠির স্পর্শ জাগানো আছে। যেমন-

"কিন্তু বেটি এরকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? এই ছটফটে মেয়েটা এতক্ষণ ধরে এরকম স্থির চোখে তাকায় কি করে? নিজের মেয়ে তার দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে নাকি? সত্যি তার বেটি তো? বেটিকে ভয় পেয়ে তার অচেনা হয়ে যাওয়া ঠেকাতে এবং তাকে খানিকটা বশ করতেই বটে, নিজের হাঁটুজোড়া মাটিতে রেখে ফুলজান দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়েকে। মেয়ের ছোট ঘাড়ে সে ঠোকায় নিজের ঘ্যাগ এবং তার ছোট মাথায় রাখে নিজের চিবুক। চিবুকে শিরশির করে ওঠে বিজবিজ আওয়াজ। তমিজের বাপ নিশ্চয়ই তার ওপর আছর করে নাতনীর মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার জানা অজানা মুনসির পাওনা শোলোক।

ফুলজান আস্তে বলে, বাড়িতে চল মা। ভাত খাবু না?

ভাত খাবার কথাতেও মেয়ে সাড়া দেয় না। তার ছোট ছোট কালো কুচকুচে পা দুটো সে শক্ত করে চেপে রাখে মাটির ওপর। বেজায় গোঁয়ার ছুঁড়ি গো! হুরমতুল্লা যে বলে, মিছা কথা নয়, এই মাঝির বংশের মানুষ বড় একরোখা। মাছ ধরা হলো এদের কুলপেশা, মাছের মতোই ঝাঁক ধরে থাকে। নদীর স্রোতের সাথে এদের খাতির, স্রোত যেদিকে চলল তো সবাই ছুটল সেদিকেই। আবার স্রোতের সাথে

www.nagorikpathagar.org

বিবাদ করতেও শালাদের বাধে না। কেমন? না, স্রোতের উল্টা দিকে চলতেও এরা মাতে সমান তালে। উজানে তো উজানে আর ভাটায় তো ভাটায়। বিলের ওপারে গিরিরডাঙ্গার মাঝিরা একজোট হয়েছে কি আজ থেকে? এরা ছিল সব মুনসির সাগরেদ তারই পেয়ারের মানুষ। কোন সেপাইয়ের গুলিতে সেই মুনসি মরে ভূত হয়েছে, সে কি আজকের কথা। তখন এই তমিজ তো তমিজ, তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরও জন্ম হয়নি, বাঘাড় মাঝির দাদা নাকি তারও দাদার জন্ম হয়েছে কি হয়নি, হলেও সে তখন গিরিরডাঙ্গায় নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন গোরা সেপাইয়ের বন্দুকের গুলিতে খুন হয়ে মুনসি তার গলার শেকল আর হাতের মাছের নকশা আঁকা পান্টি নিয়ে উঠে পড়ে পাকুড়গাছের মাথায়। সে কি আজকের কথা। মাঝির গুষ্ঠীর কুষ্টি জানতে বয়ে গেছে ফুলজানের! তবে লোকে বলে, সেই পাকুড়গাছ থেকে মুনসি নাকি বিল শাসন করছে সেই থেকে। রাতে তার পোষা গজারের ঝাঁক তারই হুকুমে ভেড়ার পাল হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কেটে বেড়ায় তামাম বিলের ওপর। তা পাকুড়গাছ হারিয়ে গেলে মুনসির আরস এখন কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে? মুনসির জায়গা কি এখন দখল করেছে তমিজের বাপ। তবে কি-না, মানুষটা নাকি একটু হাভাতে কিসিমের। তার যেমন খাওয়ার লালচ, গজার মাছগুলোকে কেটেকুটে জোনাকির হেঁসেলে চড়িয়ে দিয়েছে হয়তো ওই মানুষটাই। আর গুলি খাওয়া গতরটা মেলে দিয়ে গোল চাঁদটা কি রান্নার সুবিধা করে দিলো? ফুলজান নিশ্চিত হয়, তার বেটি এখন গজার মাছের মাথা মাথা করে রাধা ঝাল সালুনের সুবাদ পাচ্ছে। নইলে শুধু ভাতের গন্ধে এতক্ষণ হা করে নিঃশ্বাস নেয়ার ছুঁড়ি তো সে নয়।

এখন ভাতের গন্ধ আর মাছের গন্ধের কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ফুলজানের বেটির মাথার ভেতরে বিজবিজ করে কি। তাহলে এর মাথার এই বিজবিজ আওয়াজ থেকে কথার কুশি বেরুবে, সেটাকে শোলোকে গেঁথে তুলবে কি এই সখি নাই? ভাত খাওয়া ছাড়া ছুঁড়ি আর বোঝে কি। এ কি আর শোলোকে গাঁথতে পারবে?! কে জানে! কি শোলোক গাঁথবে।"

ইলিয়াস সিনট্যাকস তৈরি কখনও হ্রস্ব করে কখনও দীর্ঘ করে। কখনও সরল-সহজ। কখনও জটিল। খোয়াবনামার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে আছে। তার ডায়ালগ-কাস্টমারি। প্রাঞ্জল প্রখর এবং গতিময়।

www.nagorikpathagar.org

"এখন মুনসি নাই, তার, পাওনা-শোলকের কোনো টুকরোও কি আর সখিনার মাথায় গুণগুণ করতে পারবে? শোলক গাঁথার ক্ষমতাও তো তমিজের বাপের ছিল না।

এদিকে মোষের দীঘির ওপার থেকে মনে হয় পাথরের ওপার দিয়ে শোনা যায় হরমতুল্লাহর কাশিধসা গলার ডাক, 'ফুলজান, ও ফুল উল জা আ ন।' ফুলজান একটু চমকে উঠলে তার নজর কাঁপে। দেখা যায়, বিলের ওপর ধীর ধীরে ওড়ে মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের বকের ঝাঁক। হেঁসেলের আগুনের ভয়ে তারা ওদিকে ঘেঁষে না। কিন্তু বিলের ওপর দিয়ে তারা আস্তে আস্তে উড়াল দিতে থাকে এপারের দিকে। একটু ঘুরে এই বুঝি তারা এসে পড়ে মোষের দীঘির ওপর ভয়ে ফুলজান উঠে দাঁড়ায়, বেটির ঘাড় ধরে ঝাঁকায়, 'সখিনা, ওমা চল। বাড়িত চল।'

বকের ঝাঁক হরমতুল্লার ঝাপসা চোখেও আবছা ছায়া ফেললেও ফেলতে পারে। লালচে কালো কুয়াশা চুয়ে আসে তার ব্যাকুল ডাক, ও ফু উ উ লজা আ আ ন। ফুলজান।'

ফুলজান সাড়া দেবে কী করে। মেয়েকে নড়াতে পারে না। মোষের দীঘির উঁচু পাড়ে লম্বা তালগাছের তলায় পুরনো উঁইঢিবির সামনে খটখটে শক্ত মাটিতে পাজোড়া জোরে চেপে রেখে ঘাড়ের রগ টানটান করে মাথা যতটা পারে উঁচু করে চোখের নজর শানাতে শানাতে সখিনা তাকিয়ে থাকে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে জখম চাঁদের নিচে জ্বলতে থাকা জোনাকির হেঁসেলের দিকে।"

ইলিয়াসের উপন্যাসে এই ভাষার দ্বন্দ্ব ও আবহিক বৈচিত্র্য আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। জীবন শিল্পী হিসেবে ইলিয়াস যেমন সংযম সুন্দর তেমনি দারুণ দ্রোহী, বিপ্লবী এবং এক আগ্নেয় সত্তা। ব্যঙ্গ বিরূপ হাস্যমধুর রসে সিক্ত করেছেন আমাদের সাহিত্যের ভুবনটিকে। অতি যন্ত্রণা, হাসি কান্না- তাঁর জীবন চেতনার একই উৎসমূল থেকে উৎসাহিত। এখানেই যেন মানব জীবন এবং মানববসতি স্থাপিত হয়ে আছে অনাদিকালের জন্য। লিককের ভাষায় বলব, Mingled heritage of teass and laughter that is our lot on earth.

সুহৃদয় ইলিয়াস সহৃদয় ইলিয়াস আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ইলিয়াসের হাসি ও কান্না, বেদনা ও বিষাদ, প্রেম ও দ্রোহ চেতনার মর্মস্রোত জেগে থাকবে আমাদের মধ্যে বহুকাল।

www.nagorikpathagar.org

ডা: জোহরা কাজীর সেবাদর্শন

মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ তখনই ঘটে, যখন সে অন্যের আত্মার আর্তনাদকে নিজের আত্মার মর্মধ্বনি করে তুলতে পারে। অন্তর্জগৎকে পাঠ করে আত্মার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে হয়। বহির্জগতের সমস্ত পাঠ তখন সহজ থেকে সহজতর হয়ে যায় তার পক্ষে। আমরা কখনো নশ্বর জীবনকে অস্বীকার করে অনশ্বর জীবনের কল্পনা করতে পারি না। জীবনকে পেতে হবে জীবনের মধ্যে, জগতের ভেতরে। ক্ষণভঙ্গুরতাকে প্রশ্রয় দিয়েই তো আমাদের চলতে হয়। আনন্দধারা ক্ষণভঙ্গুর হলে কি হবে আনন্দ তো আনন্দের ক্ষুদ্র মহলটিকে প্রাণবন্ত করে রাখে। মানুষের জীবন এ আনন্দ আর প্রাণবন্ততার খুবই দাবি রাখে। নতুন নতুন কাজের ঢলে এ আনন্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবল তরঙ্গে জীবন বয়ে যেতে থাকে। পৃথিবীতে কোনো কাজই ক্ষুদ্র নয়। ক্ষুদ্রত্বের আর বড়ত্বের হেরফর করাও সমীচীন নয়। কোন কাজটা বড় কোন কাজটা ছোট– এটা নির্ধারণ করার নিক্তি তো আমাদের হাতে নেই। দিগন্তে নানা চিহ্নের পর্যায়ক্রম আছে। তাহলে দিগন্তের কোন চিহ্নটিকে চিহ্নিত করে আমি দিক পরিবর্তন করব? আত্মার স্বরূপটি বুঝতে পারলে বস্তুর স্বরূপটিও ধরা যায়। আত্মাকে মুক্ত রাখতে হয় বস্তুর বাইরের শক্তির আক্রমণ থেকে। আত্মা বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখোমুখি হলে আক্রান্ত হয়। শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত হয়। সফল, স্বচ্ছন্দ জীবন আত্মার অধিগম্য বিষয়। Albert Einstein-এর একটি উদ্ধৃতি এখানে সংযোজন করে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করব।

"A successful man is he who receives a great deal from his fellow men. Usually incomparably more than corresponds to his service to them. The value of a man, however, should be seen in what he gives and not in what he is able to recive."

একজন সুন্দর সফল মানুষ হিসেবে তাকেই শনাক্ত করা যায় যে অপরের কল্যাণ ও অর্জনের পথকে সুগম করে দিতে পারে। একজন মানুষের সার্বিক মূল্যয়ন তখনই করা সম্ভব যখন সেই মানুষটি কতখানি তার জাতিবোধ থেকে অপরের জন্য অর্জন

www.nagorikpathagar.org

করতে পারল। পরার্থ চেতনা থেকে পরকল্যাণ চিন্তা; এই 'পরচিন্তা' মানুষকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে স্থায়িত্ব অর্জনে বিপুল সহযোগিতা প্রদান করে। মানুষের যেটুকু দেয় সেটা সে দেবে। দিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত আজীবন। জীবনের ধারায় এখানে কোনো বিরতিই নেই। মানব সেবা ধর্মে উজ্জীবিত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা: জোহরা কাজী এ ধরনের জীবন ধারায় নিজেকে অভ্যস্ত, অভিজ্ঞ করে তুলেছেন। তিনি আমাদের সময়ের এক সহৃদয় মহীয়সী নারী। মানবতার সেবায় নিবেদিত এই নারী ভালোবাসতে শিখিয়েছেন মানুষকে নারীকে শিশুকে। যে মানব শিশু স্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা ও পবিত্রতার প্রতীক।

"Look upon every man, woman, and everyone as God. You cannot help anyone; you can only serve: serve the children of the lord; serve the lord himself, if you have the privilege."

-Swamy Vevekananda.

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় ভেতরে যে সেবা ও সদাত্মার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটা ডা: জোহরা কাজীর জীবনাদর্শনে এবং তাঁর প্রায়োগিক কল্যাণ আদর্শে লক্ষ করা যায়।

জোহরা কাজী জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর। মাদারীপুর জেলার কালকিনী থানার গোপালপুরে। তাঁর পিতা কাজী আব্দুস সাত্তার। ১৮৯৫ সালে ঢাকার মিটফোর্ড কলেজ থেকে এলএমএফ পাস করেন। তারপর সার্জারিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে ভারতে যান। জোহরা কাজী তার আত্মকথায় বলেছন, "বাবার চাকরির সুবাদে ছোটবেলা থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি মানব সেবা করার জন্য ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখতাম।"

স্বপ্নই যে আকাঙ্ক্ষার বীজকুঁড়ি। যথাযথ প্রয়াস পরিশ্রম, স্বেদকণা দিয়ে স্বপ্নের শরীরটাকে বর্ধিত করতে হয়। শরীর কাঠামোকে শক্তির আধার করতে হয়। প্রাণচঞ্চল, গতিশীল করে তুলতে হয়। প্রাণের শক্তি গিয়ে যদি জীবনের গতিধারায় মিলিত হয়- তখনই মানুষ পূর্ণাঙ্গতার দিকে ধাবিত হতে থাকে।

"If man thinks only for himself and seeks everywhere his own profit, he cannot be happy. If than wouldst really live for thyself, live for others." -Seneca.

www.nagorikpathagar.org

মানুষ তো কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভাবতে পারে না। তাহলে আপন স্বার্থের কুঠার একদিন এতটা হীনশক্তির ধারে ধারালো হয়ে উঠবে যে, নিজেকেই সংহার করতে থাকবে। সে নিজে এতটুকু সুখ ভোগ থেকেও বঞ্চিত হবে। বঞ্চিত হবে স্বস্তির সিঁড়িকোঠার আলো বাতাস থেকে। যদিও একজন মানুষ আজীবন তার নিজের জীবনকেই যাপন করে যায়। তবু এ জীবনযাপন কখনো যেন অন্যের জীবনযাপনে কোনো বড় বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এই মানবিক জীবনযাপনই মানুষের জন্য কাম্য। বাস্তবিক পক্ষে কেউ যদি নিজের জন্য বসবাস করতে চায় তাকে অপরের জন্যই অনুরূপ, বসবাস করতে হবে। ডাঃ জোহরা কাজী নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে অন্যের জীবনকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, ভালোবাসতে চেয়েছেন।

তিনি জীবনযাপন করছেন, আজ অব্দি-অন্যজনদের সুখময় জীবন প্রত্যাশায়। তাঁর এ প্রত্যাশা মঙ্গলের, সুন্দরের, কল্যাণের অমৃতধারার জন্য। তার এ জীবনটা কর্মময় এবং গতিময়। তিনি কখনো কাজ ছাড়া বসে থাকেন না, কখনো ছুটে যান উল্কার মতো যখন যেখান থেকে কাজের ডাক আসে। তিনি সর্বতোভাবে এটা আশ্বস্ত করতে পেরেছেন যে, নিজের জন্য বাঁচার মানে তো আসলে অন্যের জন্যেই বাঁচা। এটা যেন তার ভেতরকার তাগিদ। আত্মার তাগিদ। বিবেকের বন্ধনে বাঁধা তার সারাটা জীবন।

১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন বেশ কৃতিত্বের সাথেই। দিল্লিতে অবস্থিত লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এটা অবশ্যই এশিয়ায় মহিলাদের জন্য প্রথম মেডিক্যাল কলেজ। তিনিই একমাত্র মুসলিম মহিলা ছাত্রী। ১৯৩৫ সালে এমবিবিএস-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সম্মানজনক পদক 'ভাইস রয়ার্স' অর্জন করেন। শৈশবে একটি খ্রিষ্টান স্কুলে তাঁরা লেখাপড়া করেন। জোহরা কাজী, শিরিন কাজী তাঁরা-দুবোন। খ্রিষ্টান স্কুলে তাঁদের বাবা তাঁদের ভর্তি করালে অনেকেই তখন ভর্ৎসনা করতেন তাঁর বাবাকে। কিন্তু তাঁর বাবা কখনও হাল ছেড়ে দেননি। বরং অটল, অবিচল থেকেছেন তাঁর চিন্তাদর্শে। অনেকে তখন এ ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এদের দু'বোনের ধর্মচ্যুতি ঘটবে। সেটা অবশ্য কখনো ঘটেনি তাদের জীবনে। ধর্মের প্রতি তাঁদের টান, ভালোবাসা বরং বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর। সেবা, মানব সেবা, এই সেবাধর্ম দিয়ে তিনি বারবার ধার্মিক হয়ে ওঠেন।

www.nagorikpathagar.org

ভারত ডোমেনিয়ন ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাঁরা দু'বোন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। দেশের খ্যাতিমান ডাক্তার হয়েই তাঁরা দেশে ফিরে আসেন। বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁর বাবাকে নিয়ে তাঁর খুব গর্ব। একজন আধুনিক চিন্তামনস্ক পিতার গর্বে গর্বিত তাঁরা। বাল্যকাল থেকেই এ রকম একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতা তাঁদের মানসিক সংগঠনটিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন। একটি মহীরূহ যেভাবে ছায়া বিস্তার করে সেরকমভাবেই। ডাঃ জোহরা কাজী আজ নিজেও আমাদের অঙ্গনের উঠোনের এক বর্ধিষ্ণু মহীরূহ। তিনি যে ছায়া বিস্তার করছেন মানব শিশুদের-মানবকল্যাণে-সেটা মানবহিতৈষণায় সমৃদ্ধ এবং অপত্য স্নেহ ভালোবাসা সঞ্জাত আর সমাতৃক।

ডাঃ জোহরা কাজী তাঁর জীবনের এ যাত্রাপথের ধুলো থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছেন অনেক বুনোফুল। নিজ জাতে কেয়ারি করে তিনি সাজিয়েছেন তাঁর সময় ও সংসারের ডালি। ডাঃ জোহরা তাঁর স্মৃতিচারণায় আমাকে একদিন বলেছিলেন, উপমহাদেশের বহু বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী, এ. কে. ফজলুল হক, কমরেড মোজাফফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিব প্রধান। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক পরিচয় ছিল। কাজী আশরাফ মাহমুদ তাঁর বড় ভাই। আশরাফ মাহমুদ হিন্দি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর বেশ ক'খানা কবিতার বই আছে। বাংলা ও ইংরেজিতে এগুলো অনূদিত হয়েছিল অনেক আগেই। কবি কাজী আশরাফ মাহমুদ ও গান্ধীজীর তৃতীয় সন্তান পাশাপাশি থাকতেন। এ সুবাদে তাদের সম্পর্কে কোনোদিন ভাটা পড়েনি। কথায় কথায় তিনি আরও বলতেন, আমার ক্লাসমেট ডাঃ সুশীলা নায়ারের বড় ভাই গান্ধীজীর ছেলের নাচের ওস্তাদ ছিলেন। আমাদের যখনই ছুটি হতো আমরা সবাই সেবাগ্রামে ছুটে যেতাম! মেয়েদের বাচ্চাদের ওষুধপত্র দিতাম। আমাদের দেখলে ওরা দৌড়ে ছুটে আসত, জড়ো হতো। যেন কত আপনজন পেয়েছে ওরা হাতের মুঠোয়। ওরা আমাদের ছাড়তেই চাইত না। গান্ধীজীও আমাদের তাঁর জ্ঞাতি, জীবনের আন্দোলনের পরম সাথী জ্ঞান করতেন। ওখানে ঐ গ্রামে আজ 'Mohatma Gandhi Medical College and Research Institute' স্থাপিত হয়েছে। ওখানে ঐ সুশীলা নায়ার ডিরেক্টর। গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীর সঙ্গেও ডাঃ জোহরা কাজীর সুন্দর সম্পর্ক ছিল। স্মৃতি চারণায় ডাঃ জোহরা আমাকে তাঁর সেগুনবাগিচাস্থ বাসভবনে অনেক কথাই বলেছিলেন, অনেক ব্যাপারে। অনেক বিষয়ে। সেটা ছিল

www.nagorikpathagar.org

১৯৯৯-এর সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ সম্ভবত। তিনি গান্ধীজীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোকার্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম ডাক্তারগণ তার ওখানে জমায়েত হয়েছিল। ভয়ে, বিষম আতঙ্কে। কখন কি ঘটে যায়, বলা যায় না, এই ভেবে। তখন পরিস্থিতি ছিল খুবই অশান্ত, অস্থির। কী রকম জমাট একটা থমথমে ভাব। ১৯৪৮-এর অক্টোবরে যে অস্থিরতার উত্তঙ্গ ঢেউ উঠেছিল। একটু শান্ত হলে ডা: জোহরা কাজী- তারা সবাই পরের বছর বাংলাদেশে চলে আসেন।

১৯২৬ সালের কথা। কাজী আশরাফ মাহমুদ All India Students Conference এর সেক্রেটারি ছিলেন। শান্তি সাম্য স্বাধীনতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন। ডা: জোহরা কাজীও যোগ দিয়েছিলেন ঐ কনফারেন্সে। প্রথম দিন তো কনফারেন্সের কাজ বেশ তোড়জোরসহই সম্পন্ন হলো, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পরদিন সভা বন্ধ করতে বললেন। ঐ সময় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জোহরা কাজীর বাসায় এক সপ্তাকাল কাটান। নানা কথোপকথনে কাজী কবি বাড়ি গুলজার করে তুললেন। কাজী নজরুল একটি হিন্দি কবিতার বই তাঁর হাতে তুলে দিয়ে পড়ে শোনাতে বললেন। আমি তাঁকে পড়ে শুনালাম। প্রাণবন্ত কবি তাঁর মগ্ন স্বভাবে শুনে যাচ্ছিলেন। এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার লাইফের অ্যাম্বিশান কি? সেবাস্তবে ব্রতী হতে চাই। আমি বললাম।

জীবাত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্য তখনই লাভ করতে পারে- যখন মানুষ তাঁর আত্মার শক্তিতে শক্তিমান মহীয়ান হয়ে ওঠে। যখন সে আত্মার শাসন মেনে চলে। যখন সে বিবেকের নির্দেশে প্রতিদিনের পথে হাঁটতে শেখে। জীবন পারাপারে পাড়ি জমায়। জীবনের এ অভিযাত্রিকতায় যে সাহস, শক্তি, নিষ্ঠা, মেধা ও মননের প্রয়োজন-এসব কিছুই জোহরা কাজীর জীবনে উপস্থিত। সেবা, সেবা, শুধু সেবা ধর্মই তাঁর জীবনের ব্রত ও সাধনা। মানুষের সেবাকেই তিনি মানবধর্ম জ্ঞান করতে শিখেছেন। এ শিক্ষার আলোক লতা হাতে করে জীবন শিখর স্পর্শ করতে চান তিনি।

আজ তার ৮৯তম জন্মদিন। এ মহীয়সী নারী আমাদের এ সমাজ ও সময়ের এক উদার আলোকবর্তিকা। আমাদের প্রত্যাশা, তিনি আরও দীর্ঘায়ু হোন। কর্মময়ী হোন। শুভ হোক তাঁর জীবনের সব ক'টি প্রভাত আর আগামীকাল।

www.nagorikpathagar.org

শ্রম বিশ্রাম আনন্দ

আজ ১ মে শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব ঘোষণার দিন।

মেহনতি মানুষের অভ্যুত্থানের দিন। স্পাইজ, পার্সনস্ ফিশার, এনজেল আত্মদান করে নিপীড়িত মানুষের যুগান্তকারী সংগ্রামের উত্তরাধিকারী তৈরি করে রেখে গেলেন। আমেরিকার এই মহান আত্মদানকারী শ্রমিকেরা মজলুম দুনিয়ার চিরকালের প্রতিনিধি। শ্রমিকের শ্রমের মর্যাদা আদায় ও রক্ষা করার মহান দূত। তাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমরতার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। তাদের কোনো মৃত্যু নেই।

গ্রেট ব্রিটেনে ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ঘটে গেল একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যাকে আমরা 'শিল্প বিপ্লব' বলি। এই শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হলো। লোহা লক্কড় ও ইস্পাত শিল্প বিকশিত হতে লাগল। শিল্প দ্রব্যে সূচনা হলো বড় রকমের উন্নতি। শিল্প বিপ্লব সম্ভব করে তুলল ভারী কলকারখানার বিকাশ। গড়ে উঠতে লাগল বড় বড় কারখানা শহর। পুঁজিবাদের প্রসার ঘটতে লাগল। এতে করে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা শুরু হতে লাগল। আর তারা 'সামাজিক শ্রেণি' ও 'রাজনৈতিক শ্রেণি' হিসেবেও শেকড় চাড়িয়ে থাকল 'তৃণমূল' পর্যন্ত। তাদের শক্তি ও সাহায্যের সীমা আর রইল না। তাদের প্রভাব, প্রতাপ ছড়িয়ে পড়তে থাকল সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত চত্বরে।

গ্রেট ব্রিটেন থেকে সমগ্র ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রগতির প্রচণ্ড উত্তপ্ত হাওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমেরিকা এবং কানাডায়ও এ বাতাস বয়ে যেতে লাগল। কারখানার উৎপাদিত পণ্য যাতে করে সারা দুনিয়া ছেয়ে ফেলতে পারে অর্থাৎ বিদেশের বাজারগুলো দখল করে নিতে পারে, সেজন্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কিভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে এর উপায় উদ্ভাবন, কূট কৌশল স্থির হতে থাকল। 'উৎপাদন বাড়াও, শ্রমিকদের খাটাও হাড়ভাঙাভাবে।' এই নীতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা হলো। শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকোতে দেয়া চলবে না। ওদের রক্ত পানি করে দেয়া ঘাম ও শ্রম দিয়ে পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলতে হবে। ভরিয়ে দিতে হবে সভ্যতার শরীর। 'দিন রাত্রি খাটাও' শ্রমিকদের। নিয়মমাফিক কোনো কাজ নয়। চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ।

www.nagorikpathagar.org

বিরাম বিরতি বিশ্রাম নেই। কাজ আর কাজ। মানুষের দেহটা তো কোনো দানবীর দেহ নয়। লোহার ডায়নামো নয়। রক্তমাংসের নাজুক শরীর। এ দেহের শ্রমের সাথে সাথে বিরাম বিশ্রাম স্বস্তির প্রয়োজন। একখণ্ড অবসর তো চাই। শ্রমিকের হাড়ভাঙা শ্রমে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ও রক্তবিন্দুতে পৃথিবীতে প্রগতির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সভ্যতা স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে, মালিকশ্রেণির ধন-দৌলত, শান শওকত বাড়ছে আর শ্রমিকের পর্ণ-কুটির আলোবাতাসশূন্য। অতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের ঘরে নেই। অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। চিকিৎসা নেই। শিক্ষা নেই। সাংস্কৃতিক হাওয়া বদল নেই। কুশিক্ষা-কুসংস্কার ছেয়ে ফেলেছে তাদের জীবন। এর প্রতিকার নেই- এই দাবিতে তারা যূথবদ্ধ হতে লাগল। সংঘবদ্ধতা গড়ে তুলতে লাগল। গড়ে তুলল ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) দাবি করল নির্দিষ্ট শ্রম ঘণ্টা-সঙ্গত কাজের সময়, সঙ্গত ন্যায্য বেতন। সেই সময়টা ছিল একেবারে গনগনে আগুনের মতো। কখনো কখনো একটানা কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে যেতে হতো শ্রমিকদের। কারখানার জ্বলন্ত চুল্লির আগুনে তাতানো পরিবেশে। অন্ধকার খনির ভেতর। রুটির কারখানায়। জুতোর কারখানায়। মিসরের প্রাচীন ক্রীতদাসদের চেয়েও ক্রীতদাস যেন তারা। মানবেতরের চেয়েও মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো তাদের। তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা আকাশের বুক ফুঁড়ে ওঠা কালো চিমনির কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কোথায় কোন অদৃশ্য দিগন্তে মিলিয়ে যেত কেউ জানত না। শুধু সাক্ষী থাকত নীরব-নিঃশব্দ প্রকৃতি। কিন্তু ইতিহাস বলে দেবে, গত শতাব্দীর আশির দশকে নির্দিষ্ট শ্রম ঘণ্টার দাবিতে আমেরিকার মেহনতি মানুষের জীবনদ্রোহের চেতনায় জাগিয়ে তুলেছিল ঘুমন্ত পৃথিবীকে। শনিবার ছিল সেদিন। ১ মে। ১৮৮৬ সাল। শ্রমজীবী জনগণ সকলের কণ্ঠ এক করে এক সুরে গেয়ে বলেছিল আট ঘণ্টা জুতো। আট ঘণ্টা চুরুট। একি! পৃথিবীকে একেবারে অবাক, হতচকিত করে দেয়ার মতো দাবি।

পিডকাটর্নের যুগে ভাড়াটে লোক লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের সভা-কমিটি, মিছিল বন্ধ করে দেয়া হতো। ১৯১৫ সালে বিপ্লবী কবি জোহিলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। ২৩ বছরের সুইডিশ নাগরিক জো হিল ১৯০২ সালে কাজের সন্ধানে মার্কিন মুল্লুকে চলে আসে। শিকাগো, সল্ট লেক সিটি বিভিন্ন জায়গায় সে কাজ করে যেতে থাকে। কবি ও গায়ক হিসেবে জো হিল বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে সময়। মরিসন নামে একজন মুদিকে হত্যা করার মিথ্যা মামলায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়। আর, ১৯১৫ সালের

www.nagorikpathagar.org

১৯ নভেম্বর জো হিলকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হয়। জো হিলের মরদেহের অবসান হলো। জো হিলের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ছিল মর্মন্তুদ আর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ছিল আরও মর্মস্পর্শী। তার জীবনের শেষ কৃত্য অনুষ্ঠানে জনভন পাসোপ সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন-তার শেষ চরণটি হলো, জো হিলের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সহকর্মীরা তার দেহভস্ম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকায় ৪৮টি রাজ্যে। শুধু ইউটাহ ছাড়া- ঐ রাজ্যটিই জোকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। সহকর্মীরা কেন এই দেহভস্ম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন? এই বিশ্বাসে যে, যে বাতাস এ দেহভস্ম, যেখানে-সেখানে বয়ে নিয়ে যাবে, ফুল ফুটবে সেখানেই। জো হিলের দেহভস্ম কবিতায় আগুন-সম্ভার থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যায়। বিশ্বাসের ফুল ফোটে।

"My body? oh if I could choose
I would to asthis it reducer.
And let the merry breezes blow
My dust to where some flower grow
Perhaps some fading flower then
Would come to life and bloom again."

জো হিলের মৃত্যু নেই। তার জীবনভস্ম কণা থেকে নতুন জীবন জেগে উঠবে আরও।

'মে ডে ইন্টারন্যাশনালে'ও সেই আগুনের অঙ্গীকার বাণীবদ্ধ হয়েছে।

"We mean to make things over
we're tired of toil for nought
But bare enough to live on; never
An hour for thought.
We want to feel the sunshine; we
Want to smell the flowers
Were sure that God willed it
And we mean to have eight hours.

www.nagorikpathagar.org

We arc summoning our forces from
shipyard, shop and mill
Eight hours for work, eight hours for rest
Eight hours for what we will."

উপরের ঐ সঙ্গীতে কি আগুন ছড়িয়ে আছে। আজও এর আবেদন একটুও কমেনি আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের কাছে। আজও পৃথিবীর বড় বড় শহরের রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে মিছিল করে ঐ গানটি গেয়ে ফেরে তারা। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উত্তাল অঙ্গীকারে। এ গান তাদের সংকল্পের বাঁধনটা শক্ত করে দেয়। তাদের এ দাবি জীবনের দাবি। রুটি রুজির দাবি। তাদের এ দাবি সুন্দর মানুষ হয়ে, মনুষ্যত্ব বোধ জাগিয়ে তুলে স্বস্তিময় জীবন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচার অঙ্গীকারে উৎকীর্ণ। মহান 'মে দিবস' দুনিয়ার মেহনতি মানুষের মিলনের দিন। এই মিলন মোহনার উৎসে তাদের জীবনের সমগ্র সঙ্গতি গড়ে ওঠে। এদিনে তারা স্বাধীন ঐক্য-চেতনায় খোলা আকাশের নিচে প্রাণ ভরে শুধু নিঃশ্বাস নিতে পারে। পৃথিবী ধীরে ধীরে আরও মানবিক হতে থাকলে মানুষে মানুষে বৈষম্য, জাতপাতের পুঁতিগন্ধ, হিংসা বিদ্বেষ, বিসম্বাদ বিলীন হতে থাকবে। পৃথিবীর 'প্রগতি' ও 'সভ্যতার' শুদ্ধ বিবেচনা হবে। সে দিনের সভায় নতুন করে জেনে নেবে আগামী দিনের মানুষেরও মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই দিনে পৃথিবীবাসী একটি বিশাল সমুদ্র ও অনন্ত আকাশের মতো স্বপ্নময় হতে পারে। এদিনের সংকল্প, আগামী দিনগুলোকে জয় করে নেয়ার। শোষণের জোয়াল ভেঙে দেয়ার দাসত্বের বন্ধন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার। এ দিনে আমরা যদি সকলেই একযোগে একবার ভাবতে পারতাম বৈষম্য ও শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি ঘটানোর কথা। আইনে বড়ই উপকার হতো পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রতিদিনের সঙ্কট ও সমস্যা মোচন করার জন্য শুভচেতনা জাগ্রত করতে পারলে এ মহান দিনটি অধিকতর তাৎপর্য লাভ করবে। আজ নতুন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে মে দিবসের নতুন মূল্যায়ন প্রয়োজন। 'মে দিবস' নিপীড়িত মানুষের স্বপ্নকে যুগে যুগে যেন অলঙ্ঘনীয় সংহতি দিয়ে যেতে পারে।

১৮৮৬-এর পয়লা মে তাদের কেন অভিযুক্ত করা হয়েছিল? কি ছিল তাদের অপরাধ? কেন পারসনস, স্পাইজ, এনজেল, ফিলডেন, লুই লিঙ, ফিশার, মাইকেল

www.nagorikpathagar.org

স্কোয়ার এবং অস্কার নীর অমানবিক সভ্যতার শিকার হয়েছিলেন সেদিন। এ ইতিহাস আজ পৃথিবীর জানা। হে মার্কেটে বোমা ফাটিয়েছিল কারা? সে তো ঐ কর্তৃপক্ষের ভাড়াটে লোকেরাই। শ্রমিকদের ভেতরের কেউ-ই নয়। কিন্তু ফাঁসি হয়ে গেল শ্রমিকদেরই। শ্রমিকদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফ করার জোর দাবি জানিয়েছিলেন সে সময়ের বেশ ক'জন মনীষী। জর্জ বানার্ড শ' উইলিয়াম মরিসের সঙ্গে বিশ্বব্যক্তিত্বেরা। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াতেই হয়েছিল পারস্‌নসদের। ফাঁসির মঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই শেরিফ ম্যাটসনকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলতে দিন। জনগণের কণ্ঠস্বর শুনুন। কিন্তু সে সুযোগ আর জীবনে ঘটেনি। ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর তাঁদের ফাঁসি দেয়া হলো। হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় ঝুলে নিয়েছিলেন তাঁরা। ১৮৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর সেন্ট লুইতে 'American Federation of Labour'-এর সিদ্ধান্ত হলো যে, ১৮৯০ সালের পয়লা মে থেকে ঐ দিনটিকে পৃথিবীর মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও সংকল্পের দিন হিসেবে পালন করা হবে। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ক্লিভল্যান্ড। প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড 'শ্রম অসন্তোষ' প্রশমনের লক্ষ্যে বিশেষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি শ্রমিকদের অবদানকে স্বীকৃতি জানান। প্রশংসা করেন অকপটভাবে। এই শ্রমিক অসন্তোষের জন্য মালিকদের লোভ-লালসা ও শোষণের নকল জিহ্বাটাকেই দায়ী করেন। হে মার্কেট দাঙ্গাকে সামনে রেখে শ্রমিক সমাজের ওপর নেমে আসে নারকীয় নিপীড়ন। গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলতে থাকে বহু শ্রমিকের ওপর। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় শ্রমিক সমাবেশ। পুলিশি তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। শিকাগোতে পদাতিক বাহিনীর পুরো একটি রেজিমেন্ট মোতায়েন করা হয়। শিকাগোর আটজন শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে রুজু করা হয় 'এক পুলিশ হত্যার' রিপোর্ট অভিযোগ। ঐ আটজন শ্রমিক নেতা হচ্ছেন আলবার্ট পারসনস, অগাস্ট স্পাইম, স্যামুয়েল ফিলডেন, মাইকেল শোয়াব, অসকার নীবে, এডফ ফিশার, জর্জ এনজেল ও লুই লিঙ। ১৮৮৬ সালের ২০ আগস্ট আদালত অসকার নীবেকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। আর বাকি সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। একপর্যায়ে স্যামুয়েল ফিলডেন ও মাইকেল শোয়াবের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করে। লুই লিও দণ্ডপ্রাপ্তির আগেই মারা যান। ১১ নভেম্বর ১৮৮৭-তে আলবার্ট পারসন্‌স, অগাস্ট স্পাইস, জর্জ এনজেল এবং এডফ ফিশারকে ফাঁসি দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়। এই হত্যাযজ্ঞ করে, ফাঁসি দিয়ে, কারাদণ্ড প্রদান করে মানুষের ভেতরের আগুন ও স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দিতে পারেনি সেদিনের ঐ ঘৃণ্য কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মানুষের জীবন স্ফুলিঙ্গ তো অনির্বাণ, চির প্রজ্বলিত। মে দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ দিনটি উদযাপন করতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষেরা শুধু নয় জীবন-সচেতন মানুষ মাত্রই সচকিত হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে বাঁচার অধিকার আদায়ে অগ্নিময়। শোষণ, দমন ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের জীবনবাজি লড়াই। এই দিনটিতে শ্রমজীবী মানুষেরা একটি শোষণ ও মানববিদ্বেষমুক্ত দুনিয়ার মুখোমুখি হতে চায়। তারা নিঃশব্দচিত্তে অঙ্গীকার করে সৌভ্রাতৃত্বময় মুক্তির জমানা।

ইতিহাস, সভ্যতা ও মানব প্রগতির 'গতি-সমতা' রক্ষার স্বার্থে শ্রমের নতুনতর বিন্যাস প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকেই সেদিন শ্রমজীবী মানুষেরা দাবি করেছিল 'আট ঘণ্টা শ্রম' এবং 'আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা আনন্দ'। 'মহান মে'র সেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি চিরজাগ্রত করে রাখুক এটাই আজকের প্রত্যাশা।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দরের দ্রষ্টা

সুন্দরের দ্রষ্টাই কেবল জীবনের দ্রষ্টা হতে পারেন। সুন্দরকে যে দেখতে জানে না, জীবনকেও দর্শন করতে পারে না সে। জীবনকে বিষময় করে তোলে সে নিজের খেয়ালে। সুন্দরের পথ ধরে জীবনের পথ খুঁজে বের করা যতটা সহজ থেকে সহজতর, অন্য কোনো পথে জীবনে আবিষ্কার করার এমনতর সরল পথ আর খুঁজে বের করা সহজ নয়। জীবন পথের পথিকেরা একবার বলুন-জীবনের পথ কোনটা? কোন পথে জীবনের যাত্রা উদ্ভাসিত? সেই আলোকিত পথের সন্ধান কি করে আমরা পেতে পারি? সংশয়ের পথ থেকে সত্যের সন্ধানে খুঁজতে প্রয়াস করেছিলেন ফরাসি দেশের দার্শনিক রেনে দেকার্ত। দেকার্তের চিন্তার দিগন্তে সংশয়ের অস্পষ্ট রেখাগুলো বারবার ঝলসে উঠেছে। 'সত্যজ্ঞানের' আলোক ধারার সহস্র বিন্দুর উচ্চকিত বিচ্ছুরণ ছটাও তাকে আত্ম-বিভাসিত করেছে। কিন্তু সংশয় আবর্ত মুক্ত হতে পারেননি দেকার্ত। সংশয় বড় আত্মঘাতী আগ্রাসন। সে আগ্রাসন মানবজীবনের অন্তহীন সম্ভাবনার সোনালি দরোজাটাকে কুঠারাঘাত করে চলে সারাক্ষণ। এমনকি এক সময় এমনিভাবে জীবনের সমস্ত পথও অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। দেকার্ত ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতায় যেতেও তিনি ছিলেন একেবারে অপ্রস্তুত, অনিচ্ছুক এবং নিরাসক্ত। এমনকি বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধতায় যেতেও তিনি ছিলেন একেবারে অপ্রস্তুত, অনিচ্ছুক এবং নিরাসক্ত। বিয়ের ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে গিয়ে তিনি বলতেন, "No beauty is comparable to the beauty of Truth," আবার তিনি বিয়ে সম্পর্কে একটা সন্দেহের ধারণা ব্যক্ত করে বলেছেন, "When a husband weeps over a dead wife.....in spite of this, in his innermost soul he feels a secret joy."

বিশ শতকের ফরাসি দার্শনিক Etinne Gilson দেকার্ত সম্পর্কে বলেছেন : "He lived by thought alone for thought alone...never was an existence more noble than his." সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত ধারণা যেমন সহজাত ঠিক তেমনি সমমাত্রায় মারাত্মকও। আমি এখানে রেনে দেকার্তের দর্শনের আলোচনা

www.nagorikpathagar.org

করতে একটুও প্রয়াস পেতে চাই না। মানব জীবনে যে সংশয়ের একটা প্রচণ্ড 'ঘোর' (Obsession) থেকে যায়, সেই ব্যাপারটার কথাই কেবল বলতে চাই এখানে। দেকার্তের সংশয়টা কোথায়? নিজের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের সম্ভাবনার প্রতি? সম্ভবত সেটা নয়। জীবনের কোনো কোনো পরিসরে এ সন্দেহের শিকড় চারিয়ে উঠেছিল। যৌবনের সংশয় ও যন্ত্রণা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল যাদিও, বিজ্ঞান তাঁকে বারবার সান্ত্বনা দিয়েছে। মানুষ জীবনের প্রতি অদম্য অনুরাগ থেকেও কখনো কখনো সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। এটা তার চিন্তা-ভাবনার সমগ্রতা থেকে আসে না, আসে চিন্তার খণ্ডতার মধ্য থেকে। শান্তির ধারণা সুখের ধারণা, সংসার ও পৃথিবী ভোগের ধারণা মানুষের মনটাকে সবসময়ই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। স্থূল স্বার্থবোধও কাজ করে যায় ভেতরে ভেতরে। এই 'ক্ষুদ্রত্ব' মানবদেহে ও মনে ক্ষয় ও ক্ষত সৃষ্টি করে যেতে থাকে। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষয় বা পচন ধরে দেহে, কিন্তু মানুষের ক্ষয়ক্রিয়া শুরু হয় তার মস্তিষ্কে। দেহে পচন নিয়ে প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ এ মস্তিষ্কের পচন নিয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। 'বিশুদ্ধ ধ্বংসের উন্মাদনা' নিয়ে যেমন মানুষ পৃথিবীকে ধ্বংস করার প্রতিযোগিতায় নামে ঠিক তেমনি নিজের ধ্বংসকেও অনিবার্য করে তোলে এক ধরনের সংকীর্ণচিত্ততার সংক্রমণ থেকে। এ ধ্বংস এড়িয়ে ধ্বংসের বাইরে যে বিশাল সৃষ্টির ভুবন রয়েছে, সেই সৃষ্টিশীলতার পথে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে। মনুষ্যত্বের সৃষ্টিশীলতার চেতনাই সব থেকে সুন্দর, সজীবন্ত, মনোজ্ঞ ও মহৎ- এই জাগর চেতনাই কেবল পৃথিবীকে, পৃথিবীবাসীদের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎকে নিরাপদ ও নিরাতঙ্ক রাখতে পারে।

পৃথিবী আছে। পৃথিবীর জন্য মানব প্রজাতি আছে, পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পৃথিবীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে মানুষের সমাজ। সমাজের সঙ্গে সভ্যতা। সভ্যতার সঙ্গে প্রগতি, পরিবর্তন, রূপান্তর এবং বিবর্তনের ধারা। একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, আধুনিক যুগের ধর্ম হচ্ছে দ্রুতগতি ও দ্রুত বিস্তারের ধর্ম। প্রাচীনকালে কিংবা মধ্যযুগের মতো এ যুগ মন্থর নয়। ঐ যুগের ধারার গতি এ যুগের সম্ভাবনাকে আড়ষ্ট করতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এ যুগের কাঁধে অবস্থান করে নিয়েছে। ইতিহাস তো কালেরই সাক্ষী। ইতিহাস নিজের গতির ধারাবাহিকতার জয় ঘোষণা করে চলে চিরকাল। ইতিহাসের গতিধারার আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়েই তো মানুষের যাত্রা। এ অবিরাম যাত্রায় মানুষের ভূমিকাই

www.nagorikpathagar.org

প্রধান। প্রকৃতি, নিসর্গ, জলবায়ু এ ভূমিকার প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গমাত্র।

মানুষের সহজাত সৃষ্টিশীলতা প্রতিদিনই এ পৃথিবীকে জাগর, জঙ্গম, গতিশীল করে রেখেছে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। এ সৃষ্টিশীলতার পথ ধরে। জীবনের যাত্রাপথে কোনো মন্থরতা, জড়তার স্থান নেই। সমাজে বেঁচে থাকতে হয় জীবনের দরোজা খুলে দিয়ে, বন্ধ করে নয়। তাহলে যে আলো-বাতাসের পথটাও রুদ্ধ হয়ে যাবে। আলো-বাতাস না পেলে জীবন দুস্থ, দুর্বল, জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এটা তো শেষে আত্মপীড়নের শামিল হবে। রাসেলের মতে, এটা হলো প্রবৃত্তিকে পীড়ন করেও সে এক ধরনের সুখ ভোগ করতে চায়। এটা মিথ্যা সুখ। কৃত্রিম সুখের আবরণে তার জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, শেষে এ আচ্ছন্নতার আবরণ খসিয়ে ফেলতে তার জীবনের ঢের সময় কেটে যায়। বার্ট্রান্ড রাসেলও বলছেন :

"Through the spectacle of death I acquired a new love for-what is living. I became convinced that most human beings are possessed by a profound unhappiness venting itself in destructive rages. and that only through a diffusion of instructive joy can good world be brought into being."

একটা সুন্দর পৃথবীর স্বপ্ন তো মানুষের মধ্যে জেগে আছে শতাব্দীর ওপার থেকে, কিন্তু সুন্দরের স্বপ্ন যে মহত্তর জীবনের ভিত রচনা করে সে ভিত নির্মাণের চুন, সুরকি, ইট, পাথর, বালি, কাঠ, কয়লার যোগান তো মানুষকে দিয়ে যেতে হবে অবারিতভাবে। সৃষ্টিধর্মী মানুষ তো সভ্যতার জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। মানুষ প্রগতির জন্য অলস প্রহরের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে না। তাকে তো দৌড়ে যেতে হবে পৃথিবীর প্রান্তবিভাজনের পথে। আর প্রগতির দোরগোড়ায়। আমরা যে মানব সমাজের সদস্য, সে সমাজের ভিত্ তো একদিন আরও মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে আমাদের প্রেম-প্রীতি, সখ্য, ভালোবাসায়। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভগ্নিত্ব, আর সকলের অকুণ্ঠ সৌহার্দ্যতায়। আমাদের সমাজ থেকে এই মানবিক আচরণগুলো কখনো নির্বাসিত হবার মতো নয়। এসবের নির্বাসন ঘটলে সমাজের সূত্র-বন্ধন ছিঁড়ে যাবে। মানুষে মানুষে ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। সে অনৈক্যের অনিষ্ট শিকড় ছাড়িয়ে যেতে থাকবে। মানব সমাজ দেহের বিশাল জমিনের ভেতর দিয়ে। মানুষ তো আর তার নিজের হাতে সমাজের কবর খুঁড়তে

www.nagorikpathagar.org

পারবে না। তাহলে তার বেঁচে থাকার অবস্থানটাই ধ্বংস হয়ে যাবে চিরতরে। আমরা জ্ঞানে, মননে, প্রেমে-প্রীতিতে, সখ্যে-সৌহার্দ্যতায়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রগতিধারায়, নতুন মানব সমাজের সুস্থ, সভ্য বন্ধনের সেতু রচনা করতে পারি। সে সমাজ হবে সুন্দরের সমাজ। শুদ্ধ আনন্দের সমাজ। সুন্দর ও শুদ্ধ আনন্দ যেখানে জেগে থাকে, সেখানে মানুষের জীবনের কোনো বিকৃতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত, প্রকৃত সমাজ কি বাস্তবে সম্ভব? আমি বলব কেন সম্ভব নয়? ব্যাপারটা তো নির্ভর করে মানুষকে মানুষ হয়ে ওঠার ওপর। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে উপযোগী বিকাশ মাত্রায় পৌঁছাতে উদ্যোগী হলে সেটা তো ষোল আনাই সম্ভব। সুন্দরের দ্রষ্টা সেই স্বপ্নই দেখবেন।

মানব সমাজের সুখ ও শান্তি নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে অধুনা। আজ এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সুখ ও শান্তির জন্য সমাজের ভবিষ্যৎ না সমাজের ভবিষ্যতের জন্য সুখ-শান্তি। এটা সমাজবিজ্ঞানীদের বিষয়। আমি ওপথে ও তত্ত্বে পা বাড়াব না। আমি শুধু বলতে চাই, সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে সুখ আমরা রাখব কোথায়? শান্তিকে শিকেয় তুলে কোথায় ঝুলিয়ে রাখব। আমরা তো অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। সমঝোতা, সহমর্মিতা, সমযুক্তিজ্ঞান গ্রাহ্যিকতার আরক রস মিশিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারি। তবে এ কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা ভালো যে, এটা সহজ ব্যাপার নয়, এজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। পর্যাপ্ত অনুশাসন অর্থাৎ জীবন চর্চার মাধ্যমে এই মানবিক উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে, করাও সম্ভব। আমাদের ঘুণেধরা, মরচেপড়া এ সমাজের কৃত্রিম কাঠামোটাকে ভাঙতে হবে। নতুন-নতুন উপাত্ত আর উপাদান বসাতে হবে সমাজের ভেতরে ও বাইরে। অন্তর্কাঠামো সমানভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সমাজের গঠন ও সংগঠনের এ কাজটা হাতে নেবে কে? কোন রাজনীতিবিদ? বৈজ্ঞানিক? সমাজবিজ্ঞানী? দার্শনিক? কবি-সাহিত্যিক? ধর্মবেত্তা পণ্ডিত শিল্পপতি? বিত্তবান কোন ব্যক্তি? অন্য কেউ? না এটা একার কারোর কাজ নয়। সকল ব্যক্তি-গোষ্ঠী অর্থাৎ সমষ্টির কাজ। সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের, মেধা-মনন, জ্ঞান অভিজ্ঞতা সমাজের প্রতিটি পরতে বসিয়ে দিতে হবে। জানি, এটা খুব দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু কাজটা হাতে তুলে নিতে হবে প্রথমে, এই এখনই। তারপর সেই দূরপাল্লার অভিযানে নবতর শক্তিতে আর সতর্ক দৃষ্টিতে পা ফেলে এগোতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন সমাজের 'প্লিন্থটা' (plinth) অর্থাৎ ভিত্তিমূল ঠিক রেখেই নতুন সমাজের বিন্যাস ঘটাতে হবে। কারণ কোনো কিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয় না। পুরাতনের 'বহিরঙ্গে' নতুন আচার, আবরণ দিতে হয়। এতে করে পুরাতনও ধ্বংস হয় না; আবার নতুনও মাথা তুলে জেগে ওঠে সগৌরবে, সমহিমায়। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, নতুনের সংঘর্ষ বাধলে চলবে না, থাকবে অন্তরে বাইরে অন্ত্যমিল। প্রাচীনের অন্তরের যন্ত্রণা অনুভব করতে হবে নবীনদের। সে বেদনার প্রতি সহমর্মী হয়ে এর অবসানও ঘটাতে হবে নবীনদেরই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের অন্তঃপ্রবাহে তার বসবাস। সমাজ থেকে খসে পড়ে সে অন্য কোথাও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে পারে না। ঐ নৈঃসঙ্গ তার জীবন ধারায় যে বেদনার সৃষ্টি করতে পারে- সে বেদনা তো একদিন তাকে নৈরাজ্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিতে পারে। সুন্দরের সাধনা সে করবে একা একা। মানুষ তো সুন্দরের দ্রষ্টা। সুন্দরের সন্ধানে তার প্রাণপাত। সুন্দরের সন্ধানই তার একমাত্র অন্বিষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

১৯৬৯ সালের ১ জুন। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া লোকান্তরিত হয়েছেন। দেখতে দেখতে একত্রিশটি বছর পার হয়ে গেল। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। দৈনিক ইত্তেফাকের পাতায় লিখতেন। লিখতেন মোসাফির ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' ও 'রঙ্গমঞ্চ'। তাঁর 'কলম' ও 'কলাম' হয়ে উঠেছিল জনমতের দর্পণ। তাঁর ভাষা ও ভাষাশৈলী হয়ে উঠেছিল 'জনভাষা'। জনগণের চিন্তা ও চেতনার, দুঃখ ও বেদনার, আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রেরণার মূর্তপ্রতীক। বলা যায়, জনসাধারণের জীবনের প্রাত্যহিকতার চলচ্ছবি, চলমান-দৃশ্যমান প্রতিবিম্ব। বিগত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহের ওপর তার শক্তিধর লেখনীর প্রতাপের বিচ্ছুরণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনি ছিলেন আমাদের সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম পথিকৃৎ- পুরুষ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ঘটনাপুঞ্জ তাঁর নখদর্পণে থাকায় তিনি তাঁর কলামে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বভাবজাত ভঙ্গিতে মতামত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাই ছিল এই সক্ষমতার সহায়ক, পরিপূরক শক্তি। সর্বসাধারণের প্রতি নিখাদ ভালোবাসাটুকুই এই শক্তির মৌল উৎস। জনগণ যেখানে গণতন্ত্রের নিয়ামক শক্তি- সেই গণতন্ত্রই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন-দর্শন। তিনি ছিলেন লিবারেল ডেমোক্র্যাট- উদার গণতন্ত্রী। এই উপমহাদেশের ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের স্বৈরাচারী, একনায়কত্ববাদ বিরোধী আন্দোলনে আপসহীন মহান সংগ্রামী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন তিনি আজীবন। সেই আদর্শের পতাকাটি তিনি উড্ডীন রেখেছেন বরাবর। সেখান থেকে এক মুহূর্তের জন্য কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি তাঁর জীবদ্দশায়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সমাজের বাস্তব চিত্র ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট উন্মোচন করেন তাঁর স্বকৃত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমকালীন অভিজ্ঞতা ও উজ্জ্বল অভিজ্ঞান থেকেই।

একথা বলাই বাহুল্য-দেশ-কাল-সমাজ সচেতনা মানিক মিয়ার মানস পটভূমিলোক নির্মাণ করেছিলেন। এ উপাদানই তাঁর মানস নির্মিতির উৎসমূল। বাঙালির জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

জীবনের চড়াই-উৎরাই, রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক টানাপড়েন, অস্থিরতা, ভঙ্গুরতা তাঁর দৃষ্টিপথে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে পেরেছিল বলে তিনি তাই কখনো ছাড় দিয়ে কথা বলেননি। তাঁর দুঃসাহসী কলমের ডগায় বাঙালি জাতির ভেতরকার সাহস, শক্তিমত্তা ও প্রতাপের কথা যথাসময়ে যথাযথভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাঙালি জাতির উত্থান পর্বে তাঁর অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাষ্ট্রিক ভিত নির্মাণে যে রাজনৈতিক ও দার্শনিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ঐতিহাসিক ও অনিবার্য প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল; ইতিহাসের সেই দায়ভার তিনি তাঁর ঋজু স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন নিজ হাতেই-গভীর আত্মবিশ্বাসে এবং দারুণ নিঃশঙ্কচিত্তে। সে কথা কি জাতি কখনো ভুলে যেতে পারে? কিংবা কোনো বিস্মরণ-এ জাতিকে স্মৃতি ও স্মরণের ধারাক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে?

জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতার অর্জনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য যে উদারনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির 'ইনস্টিটিউশান' এবং ট্রাডিশান প্রয়োজন- সেই শুভ-সুন্দর-কল্যাণকর প্রক্রিয়াটি বিকশিত হতে পারছে না যথার্থভাবে। দুঃসময়ের নানা আঘাত, সংঘাত ও প্রতিঘাত এটাকে আহত করছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে যে গণতান্ত্রিক আদর্শ, মূল্যবোধ ও সামাজিক সহঅবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আমৃত্যু লড়াই করে গিয়েছেন; সংগ্রামে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যয়ী, প্রবুদ্ধ। এ মূল্যবোধের বাস্তবায়ন তিনি দেখে যেতে চেয়েছিলেন-কিন্তু সেটা দেখে যেতে পারেননি। মানিক মিয়ার লেখার আবেদন কখনো শেষ হয়ে যাবার কথা নয়। আজও আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে মানিক মিয়ার অভাব আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। সময়ের ক্রান্তি ও সঙ্কট থেকে উত্থান ও উত্তরণের পথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকতার মহনা ঐতিহ্য আমাদের জন্য হয়ে থাকবে উজ্জ্বল সংবর্তিকা। জীবনের যাত্রাপথে গতি-সঞ্চারক শক্তি। মানিক মিয়ার মানসলোক হলো বাঙালি জাতিসত্তার এক জ্বলন্ত আকর। আমাদের জাতীয় চেতনার শুভতর বিকাশে এবং কালের প্রেক্ষাপট সমুজ্জ্বল করার এক চিরকালীন জাগর সত্তার এ মানুষটির মরদেহের অবসান ঘটলেও অমরত্বেরই অম্লান বিভায় তিনি বিভাসিত।

www.nagorikpathagar.org

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বেলায় এখন অনুরূপ নির্যাতন বলবৎ নয়। অন্য ফরম অন্য আঙ্গিকে সে পীড়ন-পিষ্টতার চাপ এখনও রয়ে গেছে। ধরন-ধারণের পরিবর্তন ঘটলেও নির্যাতন এখন অন্যরেখ অন্যরূপ। কমিটেড যারা- বিবেকের সলতেটা জ্বালিয়ে রাখেন যারা-তারা কখনও সত্যের সলতেটাকে কখনও নিভতে দিতে পারেন না। সাংবাদিকরা কেবল সরকারের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়েই যাবেন, প্রতিবাদ করে যাবেন শুধু এমনও নয়- বৃত্তের মানব সমাজকে সচেতন রাখা সংবাদপত্রের প্রধান কাজ। এ দায়িত্ব পালন করতে পারে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকগণ। নিরপেক্ষতার নিরিখে নিরীক্ষণ করতে হয় সমাজ ও জনজীবনের সবকিছুকেই।

ইতিহাসের যে কোনো পর্বে এবং সময়ে যে কোনো মুহূর্তে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-দার্শনিক- অর্থাৎ বিবেকবান মানুষমাত্রই সচেতন, সতর্ক, সচকিত থাকতে হয়। বিশেষ করে সমসাময়িকতা, নিত্যনৈমিত্তিকতার ব্যাপারে বেশি খবরদার থাকতে হয়। উন্নয়নশীল দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য থাকা চাই অধিকতর স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক ও মানবিক নিরাপত্তা। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, সেখানে সংবাদপত্রের সেই স্বাধীনতা, সাংবাদিকের এই নিরাপত্তা ও অধিকার নেই। সত্যের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে। বহু ঝুঁকি বহু বিপদ খড়গ উঁচিয়ে আসে সরকারের কাছ থেকে। সংবাদপত্রের মালিকদের কাছ থেকেও এ ধরনের বহুমুখী নিয়ন্ত্রণ নেমে আসে। এক অদৃশ্য সেন্সরশিপের মতো। অনেক সময়ই সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপ অগ্রাহ্য করে বিপদের বহু ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়ে সামনে পা বাড়ানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মাথা নত করা ছাড়া উপায় থাকে না অনেকেরই। কিন্তু মরহুম মানিক মিয়া ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। বিপদের মুখে বরং তাঁর কলম আরো যেন ক্ষুরধার হয়ে উঠত। বিপদের মোকাবিলা করে তিনি যেন আনন্দ পেতেন। হয়ে উঠতেন অধিকতর দুঃসাহসী, তার সংগ্রামী চেতনা যেন আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠত। আমাদের সাংবাদিকতার বর্তমান চেহারা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, আমাদের তরুণ সাংবাদিকরা মানিক মিয়ার এ ঐতিহ্য অনুসরণ করছেন কি? স্বাধীন সাংবাদিকতার পতাকাতে কি তাঁরা মানিক মিয়ার মতো তেমন উঁচু করে

www.nagorikpathagar.org

ধরে রাখতে পেরেছেন? স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো এত 'জলো' হয়ে গেছে কেন? আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র কি এখন সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেছে?

"নাকি স্বাধীনতার পর সমালোচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? শুধু সমালোচনার কথা বলছি না, যে সমালোচনা আত্মচেতনার আর আত্মজিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তোলে, তেমন সমালোচনার কথাই বলছি। আমার বিশ্বাস আজকে মানিক মিয়ার মতো সাংবাদিকের প্রয়োজন আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে।"

[দুঃসাহসী তফাজ্জল হোসেন/আবুল ফজল, গ্রন্থ : অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া, পৃ : ২০]

কথাশিল্পী অধ্যাপক আবুল ফজল এখানে আবারও বলছেন- "আজ চারিদিকেই অবক্ষয়, সমাজ জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে অবক্ষয় ভয়াবহরূপে নেই। পুরনো সব মূল্যবোধ এখন নিশ্চিহ্ন নতুন কোনো মূল্যবোধও দুর্নিরীক্ষ- যে মূল্যবোধে স্বাস্থ্য আর শালীনতার লক্ষণ রয়েছে। এক ধরনের চাঞ্চল্য সর্বত্র দেখা যায় সত্য কিন্তু তাকে প্রাণচাঞ্চল্য নামে অভিহিত করা যায় না। এ যেন মরণের আগে হাত-পা ছোড়া। মনে হয় এ সময় তফাজ্জল হোসেনের মতো নির্ভীক সত্যবাদী সাংবাদিকের প্রয়োজন ছিল। যুক্তির খড়গাঘাতে যিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন মিথ্যাকে। সমাজ আর রাষ্ট্র উভয়ের সমন্বয়ের প্রয়োজন, উভয়কে হাত ধরাধরি করে চলতে হয়। যদি না চলে, অথবা যদি উভয়ের গতি হয় অবক্ষয়ের দিকে, তা হলে তা রোধ করার পথ নির্দেশের দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে সাময়িকপত্রের সাংবাদিকদের।" আমাদের সমাজ জীবনের অবক্ষয়ের এ গতি ও মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আবহমানকালের মূল্যবোধ হয়ে পড়ছে স্থির ও স্থবির। মিথ্যার জটাজাল আচ্ছন্ন করে ফেলেছে গণজীবনকে। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভেতরকার সমন্বয় ও সংস্থিতির অভাব লক্ষ্যগোচর হচ্ছে। এ দুইয়ের গতি স্থৈর্যের কোঠায় পৌঁছালে-সমাজে প্রচণ্ডভাবে নেমে আসে অবক্ষয় ও বিপর্যয়। আমরা এ অবক্ষয় মোকাবিলা করব কিভাবে। এটাকে বুঝবার পথ কি এখন অবরুদ্ধ? পথের ওপর যত বড় বড় দেয়াল গেঁথে দাঁড় করিয়ে দেয়া থাক না- কেন প্রতিবাদের ভাষাকে যতটা শক্তিশালী করা যাবে, তার ওপরই নির্ভর করবে আমরা কতখানি ধাঁধার পাঁচিল ডিঙ্গাতে পারব। আমরা কি আবারও আমাদের সমাজের দুঃসময়ের মুহূর্তগুলোতে তফাজ্জল হোসেন মানিক

www.nagorikpathagar.org

মিয়ার জীবনাদর্শের শরণাপন্ন হতে পারি না? আমাদের দেশের রাজনীতিতে আজকাল মোসাহেবী বেশ জমকালো। চাটুকারিতার ভাষার ব্লাশটা খুব ভারী। রাজনীতির এই তোষামুদে ভাষার আপতকালীন অবস্থা থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে চাইলে মানিক মিয়ার ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাব ও সাংবাদিকতার সত্যাদর্শের আলোর বিচ্ছুরণ থেকে আমরা যেন কখনো মুখ ফিরিয়ে না রাখি। মানিক মিয়াও জীবনে কখনো মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেননি।

ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক Turgot বলেছেন,

"This people is the hope of the human race. It may become the model. It ought to show the world by facts that men can be free and yet peaceful, and may dispense with the chains in which tyrants and knaves of every colour have presumed to bind them, under pretext of the public good."

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের ধারায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে লেখনী ধারণ করেছিলেন- সে লেখনী ইস্পাত সদৃশ শাণিত শক্তিধর। অসাধারণ এবং অনন্যপূর্ব। মানুষের সাধারণ আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রেরণা ও এষণার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন; মানিক মিয়াও বিশ্বাস করতেন, মানুষই মানবজাতির আশা, আকাঙ্ক্ষার উৎসস্থল। মানুষের জীবনধারার সংগ্রাম ও সতীর্থতাকে উপেক্ষা করে কখনো মনুষ্যত্বের অর্জনকে অঙ্গীকার করা যায় না। বরং মানবিকতার বিকাশ ধারার পথটাকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। মানিক মিয়া এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে।

সত্যপ্রীতি, সুন্দরপ্রীতি, মনুষ্যত্বপ্রীতি, সমাজপ্রীতি এবং সর্বোপরি জীবনপ্রীতি-মানিক মিয়ার জীবন দর্শনের দিগন্তকে প্রসারিত ও উদ্ভাসিত করেছে। সমাজের মানুষই ছিল তাঁর চিন্তাদর্শনের ভিত্তিমূল। কোনো রক্তচক্ষু, কোনো মহলের দোর্দণ্ড প্রতাপ, কালের কঠিন আঘাত, তাঁকে কখনো তাঁর চিন্তা ও আদর্শের কক্ষপথচ্যুত করতে পারেনি। আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্যোগ ও দুর্দিনের এ মহান সংগ্রামী অভিযাত্রীর অভিযাত্রিকতা আমাদের আগামী দিনের চির পাথেয় হয়ে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

গ্যুন্টার গ্রাস : অস্তিত্বের রাজপুরুষ

গ্যুন্টার গ্রাস কবি। প্রথমত দেশ এবং শেষত একজন কবি। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ভাস্কর, গ্রাফিক শিল্পী, সিরিয়াস পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। একজন মানুষ শিল্পের বেশ ক'টি মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন গত পাঁচ দশককাল। বিশ্বদিগন্তে গ্যুন্টার গ্রাসের নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর 'The Tin Drum' বের হবার সাথে সাথেই। এটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৯ সালে। সেটাও চল্লিশ বছর হয়ে গেল। জন্মেছেন তিনি ১৯২৭ সালে। তৎকালীন বাল্টিক বন্দর নগরী ডানজিগে। বর্তমানে যেটা পোলিশ নগরী গদানস্ক হিসেবে পরিচিত। গ্রাসের মননে, মানসভূমিতে সবসময়ই বিচরণ করে মানুষ সেই নিপীড়িত মানুষের স্বপ্নেরা। গ্রাস ইহজাগতিক বিষয়-আশয়কে জীবনের অন্তর্বর্তী করে তোলেন। জীবন থেকে নিসর্গ, নিসর্গ থেকে বিশাল প্রকৃতি এবং মহাপ্রকৃতির শূন্যমার্গেও তিনি পরিভ্রমণ করেন পাদবিকের মতো। তাঁর এ যাত্রা নিরলস এবং নিরন্তর। জীবনের নির্মম বাস্তব পটভূমি থেকে কখনো কখনো ছুটে যান 'সুররিয়্যালিস্ট' বলয়ের বিভিন্ন প্রান্তে। একজন সমাজ অন্তর্গত শিল্পী কি করে সুররিয়্যালিজমের ল্যাবিরিন্থ নির্মাণ করেন, রচনা করেন 'সিলুএট' এটা আমি ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পরি না। বাস্তবের সঙ্গে অতিবাস্তবের এ সংশ্লেষণ, শিল্পের অন্যতম রূপকল্প। তাঁর 'The Tin Drum' জার্মান ভাষাতে প্রথম তিন লক্ষ কপি বের হয়। খোদ মার্কিন মুল্লুকে এর অনুবাদ বের হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি। একজন শিল্পীর পক্ষে এটা একটি পরম আত্মশ্লাঘার বিষয়ও বটে। "Dog years Cat and Mouse; Local Anaesthetic From the Diary of a Snail in এসব উপন্যাস তাঁকে খ্যাতির চূড়োয় পৌঁছে দিতে থাকে দিন দিন। 'The Flounder" বিশাল উপন্যাস। পাঁচ শ' পৃষ্ঠার মতো হবে। উপন্যাসের মাত্রা ভিন্নতর। উপন্যাসের বহু অংশে তাঁর অনেক কবিতাও রয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এ উপন্যাস অনেক বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের বিভায় উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। 'The plebeians Rehearse the Uprising' এই নাটকের শিল্পপ্রকরণ ও নাট্যিক দ্বন্দ্ব এবং স্ট্রাকচার অভিনব আর অনন্যপূর্ব। সব ছাপিয়ে গ্যুন্টার গ্রাস প্রধানত এবং প্রথমত একজন কবি। এ পর্যন্ত তাঁর কবিতার অ্যান্থলজি আত্মপ্রকাশ করেছে

www.nagorikpathagar.org

পাঁচটি। এখন আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কথাও শোনা যাচ্ছে। ওসব অ্যান্থলজি আমার দেখার ও পড়ার সুযোগ ঘটেনি এখনও। গ্রাসের নোবেল 'শিরোপা' প্রাপ্তির সঙ্গে আমরাও আনন্দিত। আমাদের অভিনন্দনবার্তা জানাই তাঁকে। জানাই শ্রদ্ধা আর নিখাদ ভালোবাসা। গ্রাস এখন আরও অধীত অধ্যায় হবেন পৃথিবীর পাঠককুলের কাছে। গ্যুন্টার গ্রাস তাঁর জীবনের কাছে দারুণভাবে দায়বদ্ধ। তিনি তাঁর সময়ের মুহূর্তগুলো এবং স্বপ্নকে অঙ্গীকার করেন তার জীবনের সমস্ত উচ্চরণের মধ্যে। সংগ্রামের অগ্নিপাথরে। তাঁর এ শৈল্পিক সংগ্রাম শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন এবং নিরন্তর। গ্রাস আজ তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীর সমাজ মানসের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন। ক্রান্তি ও সঙ্কট উত্তরণের মহান সারথি তিনি। তাঁর এ সারথ্য আমাদের সময়ের-ব্যাপক অর্থে মানব সমাজের। গ্রাস অধিকাংশ শিল্পকর্মেই আত্মজৈবনিক, ইহজাগতিক এবং সময় সময় কি রকমভাবে মহাজাগতিক হয়ে ওঠেন। এসব বৈশিষ্ট্যের রাজপুরুষ কেবল গ্যুন্টার গ্রাসই। গ্রাস আমাদের সময়ের সন্নিষ্ট ও স্বাপ্নিক সেলিব্রেট।

হিটলার নারকীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে জার্মানির জনগণের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ববোধকে অসম্ভব বিপন্ন করে তুলেছিলেন। জার্মানির আরও অনেক প্রতিবাদী শিল্পীর মতোই গ্যুন্টার গ্রাসও সমকালীন পৃথিবীর প্রতিবাদী পুরোধা পুরুষ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর সাহিত্যে নিপীড়িত মানবাত্মার অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংক্ষুব্ধ চেতনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। চিত্রিত হয়েছে মনুষ্যত্বকে নির্মমভাবে নিস্পিষ্ট করার এক করুণ কাহিনীর কথা। গ্রাস কালনিরপেক্ষ জীবনের সঙ্গে কখনো শরিক হতে পারেননি। বরং কালের পিঠে পীড়কেরা যে পীড়নের নির্মম কশাঘাত হেনেছে-দানবীর দামামা বানিয়ে চলেছে, এরই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের বজ্রঘোষণা সোচ্চার করেছেন। একালে গ্যুন্টার গ্রাসের মতো সুনান্দনিক শিল্পী অবশ্যই বিরলপ্রজ। এ কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না। সমাজে বসবাস করার সাথে সাথে সমাজের দায়কেও মাথা পেতে বহন করে যেতে হবে। গ্রাস শিল্পের সুষমার জাদু মিশিয়ে সেটা করতে পেরেছেন। সমাজকে নির্মাণ করতে হবে নির্মমতার বিষকুম্ভ থেকে বাঁচিয়ে, সমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে অন্ধকারের আশাহীনতার মরা কুঁড়ি থেকে-স্বপ্নের কোরক ফাটিয়েই ফুটন্ত সকাল উদ্ভাসিত করতে হবে। এই সমাজচিত্র থেকে গ্যুন্টার গ্রাসের চৈতন্যের ধমনীর উপশিরায় কিয়ের্ক গার্ড, জ্য পল সাত্রে, আদ্রে

www.nagorikpathagar.org

মালরোর মতো দার্শিনিক সম্বোধিসম্ভূত অস্তিত্ববাদের রক্তধারা প্রবহমান। কালের চাকাটা কিভাবে ঘোরে, সময়সীমার পরিসর একজন শিল্পীকে সবই জানতে হয়-গ্রাস সেটা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। কালের চাকার ঘূর্ণন প্রক্রিয়া বুঝতে হয় সম্যকভাবে, সম্পূর্ণভাবে। অগ্রগমনের পরিপ্রেক্ষিত জানা থাকা চাই। গ্রাসের সেই মানবিক ও ঐতিহাসিক বিবেচনাটা পুরোপুরিই আছে। ফলে গ্রাস তাঁর সমকালীন মানুষের প্রতিচ্ছবিটা আঁচ করতে পারেন আবার অতীতও তাঁর স্মৃতিঋদ্ধ। এই উভয় মেরুর ঋদ্ধি তার সময়ও শিল্প ভাবনাটাকে সমৃদ্ধ সুঋদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। তিনি অতীতের দরোজা পার হয়ে সমকালের সোনালি খাঁজগুলো অতিক্রম করে ছুটে গিয়েছেন ভবিষ্যতের অদৃশ্যের উঠানে-বহুদূরের চত্বরে। এখানেই গ্যুন্টার গ্রাসের বৈশিষ্ট্যের বিপুলতা, বিশালতা। তাঁর শিল্পের এ বৈভব, বিভাব তাঁরই কেবল। ধাতব ঐশ্বর্যের পাশাপাশি ধ্রুপদী বৈভবও অর্জন করতে হবে- তা না হলে সমকালের অতল গহ্বরে সব তলিয়ে যাবে। জার্মানির সমকালীন রাজনীতির সঙ্গেও গ্রাসের সম্পর্ক আছে। সেখানে কোনো দলীয় সংকীর্ণতা তাঁকে কখনোই পেয়ে বসেনি। গ্রাসের জীবন দর্শনে সামাজিক সৌমনস্যতাই বড়। সংকীর্ণতা মহৎ কিছু অর্জন করতে সহায়ক হতে পারে না। বুদ্ধি, যুক্তি, প্রজ্ঞার সমন্বয় ছাড়া জীবনের মুক্তি ঘটে না কখনো-এটা গ্রাস বুঝতেন স্পষ্ট করে। তিনি স্বপ্নের সঙ্গে সজ্ঞার যোগ চান। সম্মতি চান। এই সম্মিতির প্রয়াস এখনও তেমনি সক্রিয়। গ্যুন্টারের কবিতায়, নাটকে এবং উপন্যাসে মানুষের অতীত সংস্কৃতির ধারাক্রম, পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন এবং অধুনাতন সমাজের রূপান্তর বিবৃত, বিধৃত এবং বিকশিত হয়েছে নিপীড়িত পৃথিবীকে অনবরত পিষ্ট করে চলেছে, তাই বলে অত্যাচারই সভ্যতার শেষ কথা নয়। এক অত্যাচার আসে অসৎ তৎপরতার হিংস্র ছোবল বিস্তার করে। একদিন এর অবসান ঘটে। নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে। আবার অন্য নির্যাতন এসে তছনছ করে যায় মানবকুলের কোনও প্রান্তরগুলো। সেটাও প্রতিহত হয় নিপীড়িতের যূথবদ্ধ সংগ্রামের প্রবল ধারায়। মানবতা লাঞ্ছিত হয় ক্রমাগত। মুক্তিও ঘটে। মুক্তি ঘটে বারবার। এই সত্য ও মনুষ্যত্ববাদের তত্ত্বের কথাই গ্যুন্টার তাঁর সময়ের সমাজ ও পৃথিবীকে শুনিয়েছেন, তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে-ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে, প্রাচীন মিথ ব্যবহার করে। মানুষের অতীতের সঙ্গে তার জীবন ধারার অন্ত্যমিলটা কোথায় সেটা খুঁজে বের

www.nagorikpathagar.org

করেছেন গ্যুন্টার। আর এই অন্ত্যমিলটুকু এখনও যে কতটা অর্থবন্ত সে কথাও বলেছেন সমসাময়িক পৃথিবীকে তিনি। মানুষের ভেতরকার সৌজন্য, সৌমনস্যতা এবং মনুষ্যত্বের শক্তির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন গ্যুন্টার। তাঁর 'Stream of Consciousness' ফল্গুধারার মতো প্রবহমান। বিবেকের এই জীবন পুরোহিতকে যুদ্ধোত্তর জার্মানির 'বিবেক' বলা হয়। তাঁর মানবিক বিবেচনা, নিঃসন্দেহাতীতভাবে, সমকালীন ও ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষকে প্রাগ্রসর করে তোলার এক অনিবার্য ভূমিকা। পাঁচ দশক যাবৎ গ্রাস এ মহান মানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ জন্য তার স্ব-সমাজ, স্ব-জাতিক এবং বৈশ্বিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল।

গ্রাসের সমস্ত শিল্পকর্মেই স্যাটায়ার, তীব্র শ্লেষ সক্রিয় থাকে। নিচের অনুবাদকৃত কবিতাগুলো থেকে আমরা তাঁর মানবভূমির মর্মমূলে প্রবেশ করার কিছুটা প্রয়াস করতে পারি। 'To All Gardeners' কবি বলেছেন,

'To All Gardeners' (উদ্যান পালকদের জন্য)

"Why should you till me to eat no meat?
Now you come to me with flowers,
Prepare asters,
as if autumn's aftataste was not enough.
Leave the carnations in the garden.
So what, the almonds are bitter,
the gasometer
which you call the cake-
till I ask for milk.
You say vegetables-
and sell me roses by the kilo.
Healthy, you say, and mean the tulips.

www.nagorikpathagar.org

Should I eat with some salt

the poison

tied in little bunches?

Should I die of lilies-of-the valley?

And the lilies on my grave-

Who 'll protect me from the vegetarians?"

বাংলা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি-

"তুমি কেন আমাকে শুধু শুধু মাংস খেতে নিষেধ করো?

এখন তুমি এক তোড়া ফুল নিয়ে আমার কাছে এসো,

কতগুলো ফুলের তোড়া তৈরি করব বলে,

যেন শরতের চূড়ান্ত মুহূর্তেও শেষ পর্ব নয়

কার্নেশানগুলো বাগানেই থাক

কি হবে বাদামগুলো তেতো থাকে যদি

তোমরা যাকে পিঠা বলো-

আমি কিন্তু দুগ্ধই চাই।

তোমরা বলবে শাক সবজির কথা-

আর আমাকে গোলাপফুলের মতো বিক্রি করো সের দরে

ফুলগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান, তোমরা এমনটা বলো।

আমার কি কিছু লবণ মিশিয়ে বিষ পান করতে হবে?

লিলিগুলোকে ছোট ছোট তোড়ায় বেঁধে?

লিলিফুলের উপত্যকায় আমি কি মৃত্যুশয্যা পাতব?

আমার কবরের ওপর যে লিলিফুলগুলো

তারা কি আমাকে নিরামিষভোজীদের হাত থেকে রক্ষা করবে?

কবি কেন লিলিফুলের উপত্যকায় তাঁর মৃত্যুশয্যা পাতার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন? লিলিফুলগুলো কি কবিকে নিরামিষভোজীদের হাত থেকে রক্ষা করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে কখনো?

"Let me eat meat
Let me be, with the bone,
Let the bone lose all shame and show itself naked.
Only when I rise from the plat.
and loudly do the ox honour
only then open up the gardens
for me to buy flowers-
because, I like to see them dying."

"আমাকে মাংস খেতে দাও।
হাড়গোড়ের কোনো লজ্জা শরম নেই তারা নগ্ন হয়ে থাকে।
সবেমাত্র আমি যখন খাবার থাল ফেলে উঠে পড়ব
এবং বেশ জোর গলায় ষাঁড়ের প্রশংসা করব
ঠিক তখনি বাগানের দরোজাটা খুলে দিয়ো
যাতে করে আমি ফুল কিনে নিতে পারি-
কারণ আমি তাদের মৃত্যু দেখতে চাই।"

উপরিউক্ত কবিতায় গ্রাস সভ্যতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতার ডিকশানও সম্পূর্ণ আলাদা এবং দুর্বোধ্যও বটে। তাঁর কবিতার পঙক্তিমালার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে কটাক্ষ, ভর্ৎসনা আর সংক্ষোভ।

খোলা হাওয়ার কনসার্ট (Open Air Concert)

"বিরতির সময়টা যখন শেষ হয়ে আসছিল

আরেলিয়া হাড়গোড়সহ এসে পৌঁছাল।

আমার বাঁশি এবং শাদা জামাটা তাকিয়ে দেখো;

আর তাকিয়ে দেখো ঐ বেড়ার ওপর দিয়ে আধ-বোজা চোখে তাকানো জিরাফটাকে।

www.nagorikpathagar.org

এগুলোই আমার রক্তকণা, ধমনীতে স্পন্দন তুলেছে।

আমি এখন জয় করে ফেলব সব গায়ক পাখিদের।

যখন হলুদ কুকুরটি পার হয়ে যাচ্ছিল নদী তীরের তৃণভূমি

ঐ খোলা হাওয়ার কনসার্ট শেষ হয়ে গেল।

পরে আর অস্থিটি খুঁজে পাওয়া গেল না।

সঙ্গীতের স্বরগ্রামগুলো চেয়ারের তলায় গড়িয়ে পড়ে যেতে থাকে,

আর ঐ সঙ্গীত পরিচালক হাতে তুলে নেয় এয়ারগান
এবং গুলি ছুড়তে থাকে গায়ক পাখিদের দিকে।"

'Open Air Concert' কবিতায় কবি বলেছেন : "বিরতির সময়টা যখন হয়ে আসছিল/সরেলিয়া হাড়গোড়সহ এসে পৌঁছানো/.....ঐ খোলা হাওয়ার কনসার্ট শেষ হয়ে যাচ্ছিল নদী তীরের তৃণভূমি/পরে আর অস্থিটি খুঁজে পাওয়া গেল না/সঙ্গীতের স্বরগ্রামগুলো চেয়ারের তলায় গড়িয়ে পড়ে যেতে থাকে।"
এই সময়ের মুহূর্তেই সঙ্গীত পরিচালক হাতে কেন তুলে নেয় এয়ারগান- কবি প্রশ্ন করেন। কেন গুলি ছুড়তে থাকে গায়ক পাখিদের দিকে-কবি প্রশ্ন করেন বার বার। 'স্তবগান' (Hymn) কবিতায় তিনি একটি বুলবুলিকে ধাতব সভ্যতার প্রতীকে কেমন জটিল করে প্রতীকৃত করেছেন। আবার তাঁর 'আত্মার' মতন সাদাসিধে করে বিম্বিত করেছেন।

'স্তবগান' (Hymn)

"একটি বুলবুলির মতন জটিল,
নরম টিনের শব্দের মতন ঝনঝনে,
হৃদয়বানের মতন,
ধোপদুরস্তের মতন, ঐতিহ্যসম্পন্ন,
কাঁচা টক আঙুরের মতন, আঁকাবাঁকা ডোরা দাগের মতন,
প্রতিসাম্যের মতন,
কেশাবৃতের মতন,

www.nagorikpathagar.org

পানির সন্নিকটে এবং বাতাসের মতন বিশ্বস্ত,
অদাহ্য বস্তুর মতন, সচরাচর উল্টে ফেলার মতন,
বালখিল্যতার মতন সহজ, বুড়ো আঙুলের ছাপ মারা,
নতুন এবং ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দের মতন, যেন খুব ব্যয়বহুল,
গভীর ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরের মতন, গৃহপালিতের মতন,
সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতন, জ্বলজ্বলে কেজো কিছুর মতন,
মৃদু বয়ে যাওয়া, হিম কনকনে ঠাণ্ডা বরফের মতন,
মুখাপেক্ষীহীনের মতন, প্রাপ্তবয়স্কের মতন,
হৃদয়হীনের মতন,
মরণশীলের মতন,
আমার আত্মার মতন সাদাসিধে।"

গ্রাস 'স্তবগান' গাইতে গাইতে গভীর ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরের মতন, গৃহপালিতের মতন সহজভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন। মানুষের মুমূর্ষু অবস্থার ছবি এঁকেছেন; তিনি সমকালীন সভ্যতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

রাতের স্টেডিয়াম এবং 'ব্যর্থ হামসনা' কবিতায় সুররিয়্যালিজমের মোড়কে জীবন যুদ্ধের সময়াবর্তকে লক্ষ করব।

Stadium at Night (রাতের স্টেডিয়াম)

"Slowly the football rose in the sky.
Now one could see that the stand swere packed.
Alone the poet stood at the goal
but the referee whistled: off side."

ধীরে ধীরে ফুটবলটি আকাশে উঠে গেল।

এখন তা কেউ দেখতে পারত ভিআইপি গ্যালারিটা কানায় কানায় ভর্তি।

-কবি গোলপোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একাকী;

www.nagorikpathagar.org

[কিন্তু রেফারি বাঁশি ফুঁকল: 'অফ সাইড'

Unsuccessful Raid (ব্যর্থ হামলা)

"On Wednesday
Everone knew how many steps,
Which bell to ring.
the second door on the left.
They smached the till.
But it was Sunday
and the cash was at church."

"বুধবার।
প্রত্যেকেই জানত কতগুলো ধাপ,
কখন
কোন ঘুণ্টিটা বাজাতে হবে,
বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় দরোজা।
তারা ভেঙে চুরমার করে ফেলল কাউন্টারের দেরাজ
কিন্তু সেটা ছিল রোববার
এবং নগদ টাকা পয়সা ছিল গির্জায়।"

Normandy (নর্মান্ডি)

"The pillboxes on the beach
cannot get rid of their concrete
At times a moribund general
arrives and strokes the loopholes.
Or tourists come to spend
five agonized minutes-
Wind, sand, paper and urine;

www.nagorikpathagar.org

the invasian goes on."

"সুমুদ্র-সৈকতের কংক্রিটের কেল্লাগুলো
কখনো মুক্তি পায় না ঐ কংক্রীটের বন্ধন থেকে
সময় সময় মৃতপ্রায় জেনারেল
এসে ধীরে ধীরে হাত বুলায়
জানালা প্রাচীর গাত্রের ছিদের ওপর
অথবা সেখানে ট্যুরিস্টরা পাঁচটি যন্ত্রণাকাতর মুহূর্ত
কাটিয়ে দিতে ছুটে আসে
বাতাস, বালি, কাগজের ছেঁড়া টুকরো এবং প্রস্রাব;
কেবল জবরদখল চলছে নিরন্তর।"

The Sea Battle (সমুদ্র যুদ্ধ)

"An American aircraft carrier
and a Gother catheral
simultaneously sank each other
in the middle of the pacific
To the last
the yound curate played on the organ
Now aeroplanes and angles hang in the air
and how nowhere to land."

"একটি মার্কিনি বিমানবাহী জাহাজ
পথজাতির কাথিড্রাল
সমুদ্রের মাঝখানটায় ডুবিয়ে দ্যায়।
এবং শেষ মুহূর্ত অব্দি
ঐ পল্লী গির্জার যুবক যাজক বাদ্যযন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

বাজিয়ে চলল।

তারপর শূন্যে ঝুলে থাকা বিমানগুলো আর দেবদূতদের

মর্ত্যে কোথাও নেমে আসার একটু জায়গা পর্যন্ত নেই।"

আমি জার্মান ভাষার সঙ্গে একটুও পরিচিত নই। Penguin Books-Gi Selected Poems-of GUNTER GRASS থেকে Christopher Middleton I Michael Hamburgere-এর ইংরেজি অনুবাদকৃত কবিতাগুচ্ছ থেকে আমার সক্ষম বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে ধরছি। সহৃদয় পাঠকেরা মূল কবিতা পাঠ করেই কেবল এগুলোর যথার্থ স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।

গ্রাস বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মহত্তম ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক। এ বছর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সাথে সাথে বইয়ের স্টলগুলোতে উপচে পড়ে ক্রেতার ভিড়। স্টেইডেল প্রকাশনা সংস্থার ১ লাখ বইয়ের মজুদ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য বর্তমানে ৯ লাখ ৬০ হাজার ডলার। আগামী ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে সুইডেনের রাজা কার্ল গুস্তাফের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার গ্রহণ করবেন তিনি। এ পুরস্কার মানুষের জন্য মানুষের স্বার্থে, মানবিকতার ব্রতে ব্যয় করবেন গ্রাস। গ্রাস বলেছেন, নোবেল পুরস্কারের অর্থের অংশ তিনি ব্যয় করবেন 'সিন্টি' ও 'রম' নামের জিপসি মানুষদের সেবা ও কল্যাণে। নারকীয় নাৎসীয়তার বিভীষিকার কথা গ্রাসের মনে আছে। জার্মান জাতির কাঁধে এখন অব্দি ঝুলে আছে নাৎসীবাদের বিভীষিকা। 'নিও-নাৎসীইজমের' ব্যাপারে তিনি নিজেও যেমন সজাগ এর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গ্যুন্টার গ্রাস এক সাক্ষাৎকারে নোবেলে 'শিরোপা' লাভের পর বলেছেন-

'প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যখন কোনো লেখকের বই পঠিত হতে থাকে, তখনই সেটা সেই লেখকের জন্য সবচে' সুন্দর মহার্ঘ অভিজ্ঞতা।

গ্যুন্টার গ্রাস সমকালীন বিশ্ব শিল্পভুবনের এক স্থপতি। মানব জীবনের মহান ব্যাখ্যাতাও তিনি এবং মানব অস্তিত্বের প্রধান রাজপুরুষ।

www.nagorikpathagar.org

আলোক উদ্যানে অনিন্দ্যকান্তি মুকুল

মুক্তিযুদ্ধের মানসবৃন্তের একটি মুকুল প্রকৃতির নিয়মে ঝরে পড়ল। কালধর্মের উর্ধ্বেতো কেউ নয়- কোনো কিছুই নয়। এই পৃথিবীর আলো-বাতাস, রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসের ছটা, রজনীর সুস্নিগ্ধ নিবিড় উদ্ভাস, সংসারের সকল মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, ধূলি ধূসরতা সব ফেলে রেখে একদিন সকলকেই চলে যেতে হয়, চলে যেতে হবে- এম আর আখতার মুকুলও তাই চলে গেলেন। চলে গেলেন শেষ শয্যায়- জীবনের অন্য এক প্রান্তরে, অতল মৃত্তিকা গহ্বরে। ঐ অলৌকিক আলোকধাম থেকে উঁকি দিয়ে হয়তো তিনি আমাদের দিকে একটু তাকাবেন, দেখবেন, আমাদের প্রতিদিনকার প্রগাঢ় ভালোবাসা আগের মতোই বুঝি অটুট রয়েছে। গভীর, নিবিড়তর হয়েছে আরও। হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে। একজন মহত্তর মানুষের সেটাই প্রত্যাশা।

মুক্তিযুদ্ধের মহান শব্দসৈনিক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্রের' রূপকার, ভাষ্যকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহান ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট, মুক্তপ্রাণ বুদ্ধিজীবী এম আর আখতার মুকুল এই বিপুল জগৎ সংসার ফেলে রেখে চলে গেলেন। ২০০৪ সালের ২৬ জুন সন্ধ্যা ৬টায় বারডেম হাসপাতালে তাঁর নশ্বরদেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অন্য এক স্বর্গীয়গ্রামে। যেখানে অনন্ততা, যেখানে সাতত্য, যেখানে নাশ্বততা। অমর্ত্যের আলোক উদ্যানে, নৈঃশব্দের নীপকল্পভূমে- কী গভীর নির্জন! নিথর পত্রপল্লব মর্মর!

আমি রাতের সংবাদে শুনলাম মুকুল ভাই আর নেই। বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না। কিছুটা স্তব্ধ, নিঃশব্দ, স্থির হয়ে রইলাম।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজধানী নগরীর সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এলো। স্বদেশের সকল শ্রেণির মানুষের চোখের কোটর অশ্রুসজল হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখে ভেসে ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই গনগনে আগ্নেয় দিনগুলোর কথা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বরের কথা। 'চরমপত্রে' প্রচারিত তাঁর রাজনৈতিক ভাষ্যের কথা। এম আর আখতার মুকুলের সেই

www.nagorikpathagar.org

দ্রোহবিধৃত শব্দাবলি কেউ কখনো ভুলবে না। আমরা কেউ ভুলব না। ভুলবে না এ জাতি। 'চরমপত্র' ছিল সেদিনের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের হৃদপিণ্ড। প্রধান চালিকাশক্তি। স্বাধীনতার ভাষা-স্বাধীনতার আমোঘ উচ্চারণ। আমি পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর বেইলী রোডস্থ বাসায় চলে গেলাম। প্রথম জানাজায় শরিক হতে। অশ্রুসিক্ত কবি ও সাগর আমাকে জড়িয়ে ধরল। আলী, রমজান ডুকরে কেঁদে উঠল।

জীবমাত্রই, সকলকেই তো একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। এম আর আখতার মুকুলও প্রকৃতির একই নিয়মে একই চলমান ধারায় চলে গেলেন। আর ফিরবেন না কোনোদিনও এ মানবিক কোলাহলে। মাত্র ক'দিন আগে আমি তাঁকে বারডেমে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর রোগমুক্তির বিপুল আশা বুকে করে। দীর্ঘক্ষণ তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে নীরবে নিঃশব্দে প্রার্থনায় অন্তর্গত হয়েছি। কবিতা, কুন্তলা, সঙ্গীতা তাঁর আত্মজাদেরকেও প্রার্থনার নৈঃশব্দে নিমগ্ন দেখেছি। তসবিহ, তাহলিল করতে দেখেছি। তাদের চোখের পাতা ছাপিয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। অশ্রুকণাগুলো ছিল কী রকম বেদনা-বিধুর, বিষণ্ন মেদুর। আমি বললাম, মা, তোমরা ধৈর্য ধরো। আর প্রার্থনা করো সর্বময় অন্তর্যামির কাছে। একান্তে-আত্মার গভীর কোথাও থেকে।

আমি আমার প্রার্থনা আর সমবেদনা, সহমর্মিতার নৈবেদ্যটুকু রেখে এলাম ওখানে। আমি মন্তব্য খাতায় লিখলাম-"বাঙালি জাতির ইতিহাসের বরপুত্র- এম আর আখতার মুকুল-আপনি আমাদের জাতির স্মৃতিসত্তা। আপনি এক মহান চিরঞ্জীব পুরুষ।" আবারও তাঁর রোগমুক্তি কামনা করে পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্ততার কথা জানিয়ে ধীরে ধীরে ওখান থেকে চলে আসছিলাম। পাশ ফিরে একটু তাকাতেই দেখলাম- ওরা আরও সকাতর, অশ্রুসজল।

"মানুষের মধ্যে দু'টো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব।"

[রবীন্দ্রনাথ/রাশিয়ার চিঠি/উপসংহার]

মানুষ তার প্রতিদিনকার আচরণ ও ব্যবহাররীতির মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা পরিচালনা করে। এ স্বভাবসত্তার প্রাতিস্বিকতায় বাস্তবকে মূর্ত করে রাখে। এ বাস্তবতা যদি তাকে সমাজের সঙ্গে সকলের দাবি ও অঙ্গীকারের মধ্যে যুক্ত করে তখন সে মানুষ সম্পন্ন হতে থাকে, সমাজের বিকাশধারার মধ্য দিয়ে। এ বাস্তব বিকাশধারাটিকে এম

www.nagorikpathagar.org

আর আখতার মুকুল তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজস্ব আঙ্গিক ও মাত্রা যোজনা করে। তিনি সমাজের সঙ্গে ছিলেন সব সময়ই। সমাজচ্যুতি ঘটেনি কখনো তার জীবনে। এখানেই তার জীবনের সার্থকতা। এদিক থেকে তিনি অনন্যপূর্বতার দাবিদার।

কবি ও কথাকোবিদ Oscar Wilde বলেছিলেন :

"For he who lives more lives than
Once more deaths than one must die."

এম আর আখতার মুকুলের তিরোধানে আমি বলব, তিনি একটি জীবন আধারে, রক্তমাংসময় নশ্বরদেহের কাঠামোতে যাপন করেছেন বহুমাত্রিক জীবন। তাঁর জীবন যাত্রায় আমরা দেখেছি মরতাকে জয় করে যাবার এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। এ শক্তিই বুঝি মানুষের জীবনটাকে করে তোলে সমুদ্রপ্রতিম, উদার নীলিমাসদৃশ। যে মানুষের জীবনতরঙ্গমুখর, সে মানুষই জীবিত। মৃত্যু তাকে পরাজিত করতে পারে না। ঐ মানুষ সমাজমনস্ক। সমাজের দাবি সে মেটাতে পারে। মৃতের কাছে কে যায়? জীবিতের কাছেই সকলের সঙ্গত দাবি থাকে। মনুষ্যত্বের পালাক্রম বিকাশের ধারায় মানুষ সৃষ্টিশীল হতে থাকে ক্রমাগত। ঐ জীবনের ভেতর শূন্যতা থাকে না, কেবল পূর্ণতায় মনুষ্যত্বমণ্ডিত হতে থাকে সে জীবন। আমি এ জীবনের কথাই বলছি। সংগ্রামে, যাত্রাপথের কঠোর অভিযাত্রিকতায় এম আর আখতার মুকুল জীবনের সেই সোনালি সিঁড়িগুলো রচনা করে গেলেন।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'জগতের এপারেই ঝটিকা, পরপারে চিরশান্তি।' তার জীবনস্বরূপ বৃক্ষের পত্রালি কতভাবে, কত প্রচণ্ডতায় হয়েছে- সঞ্চালিত হয়েছে, জীবনের মুকুল নানা অভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে- তবু তিনি কখনো টলে পড়েননি একটুও। তিনি যে বেঁচেছিলেন, তাঁর মৃত্যু সে কথাই আরো যথার্থ করে গেল। তাঁর মৃত্যু যেন এক মহত্তর মৃত্যু। সমাজের সচল অবস্থা থেকে এ ধরনের মানুষেরই একদিন অন্যতর শাশ্বতিক অলৌকিক আবহ ও অবস্থার ভেতর, স্বর্গীয় বাতায়নের বিভার ভেতর প্রবেশ করেন। এটা এই মর্ত্য, লোকচক্ষুর সাময়িক আড়াল হওয়া মাত্র। এর অতিরেক আর কিছুই নয়। জগতের প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে অ-প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে চলে যাওয়া। সেখানে মহাকাল আরেক আগামী, আরেক ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে। এম আর আখতার মুকুল-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়

www.nagorikpathagar.org

ষাটের দশকের শুরুতে। মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'দৈনিক আজাদ' অফিসে। সেখানে মোহাম্মদ মোদাব্বের, মুজীবর রহমান খাঁ, জগলুল হায়দার আফরিক, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আনিসুজ্জামান, তোয়াব খান, আখতার-উল আলম, আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, কবি হাবীবুর রহমান প্রমুখের সঙ্গেও। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। চার দশকের অধিককাল সময় তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা এবং মানসিক আত্মীয়তা। তাঁর ভেতরটা ছিল খুবই স্পষ্ট, স্বচ্ছ, খোলামেলা। কথায় বার্তায় খুবই আন্তরিক, উদার প্রকৃতির। তিনি ছিলেন একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। আড্ডাপ্রিয় এই মানুষটি ১৯৫১ সালে দৈনিক সংবাদে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালের প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনের সময় ঢাকায় হাটখোলা রোডে প্যারামাউন্ড প্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাক বের হতো। সংবাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এম আর আখতার মুকুল দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন রিপোর্টার হিসেবে। এখানে রিপোর্টিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কিছুদিন পর ইত্তেফাক ছেড়ে দিয়ে তিনি দৈনিক আজাদে জয়েন করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পূর্বে তিনি একটি আমেরিকান সংবাদ সংস্থার ব্যুরো চিফ ছিলেন। ২৫ শে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর তিনি আর ঢাকা থাকেননি। গোপন পথে কলকাতা চলে যান। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যোগদান করেন। আমি সে সময় জামালপুরের ধানুয়া কামালপুর সীমান্তপথে রামরামপুরা হয়ে ভারতে চলে যাই। কিছুকাল মহেন্দ্রগঞ্জ গফুর মামার বাড়িতে আমরা অবস্থান করি। মেঘালয় রাজ্যে। সেখানে বাংলা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাও আমার সঙ্গী হন। কায়সার রিয়াজুল হক, তারেক ফজলুর রহমান, শামিম আল মামুন, শ্রমিক নেতা সৈয়দ আব্দুল মতিন, খন্দকার বাবুল প্রমুখ। আমাদের সঙ্গে ওখানে এক রাত্রি কাটান আওয়ামী লীগ নেতা মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল ও সেতাব আলী খান। তারা সকলেই মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সঙ্গী-সারথী ছিলেন। এখানে কিছুদিন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পে গেরিলা 'ওয়ার ফেয়ার' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করি বাংলার দামাল বীর ছেলে সন্তানদের। ভারতের ক্যাপ্টেন নিয়োগী আমাদের সহায়তা করতেন ওখানে। ওখানে কিছুদিন থাকার পর আমি কলকাতা যাই। এ সময় মেঘালয় স্টেটের সাং সাং গিরি ক্যাম্পে এক রাত্রি অবস্থান করি। জামালপুরের সংসদ সদস্য আবদুল হাকিম তখন খুবই আন্তরিক, সহৃদয় ছিলেন আমার প্রতি। এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় কলকাতার থিয়েটার রোডে এসে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছাই। ওই সন্ধ্যায়ই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করি। খানিকক্ষণ কুশলাদি বিনিময়ের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাই আমাকে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের সাথে দেখা করতে বলেন। এর মধ্যে তিনি 'মান্নান ভাইকে' ফোনও করে দেন। মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে আমি কিছুদিন কাজ করি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' কথিকাটির ভাষ্যকার এম আর আখতার মুকুল। 'চরমপত্র' ও তাঁর কণ্ঠস্বর সেদিন বাংলার মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে পড়েছিল। সেটা ছিল বাংলা ও বাঙালির জাতীয় কণ্ঠস্বর। এখানেই এম আর আখতার মুকুলের জীবনের মহত্তম অর্জনের কথাটি উঠে আসে। তার জীবনের কৃতী ও কৃতিত্ব এখানেই ধরা পড়ে, অনন্য সাধারণভাবে। মুকুল ভাই চলে গেলেন বাংলাকে ভালো বাসতে বাসতে। বাংলার মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে গেলেন-

"আমি বাঙলার।
আমি বাঙলার লোক,
আমি বাঙলাকে ভালবাসি।"

এই বাংলার মৃত্তিকায় স্বর্গীয় গহ্বরে চিরআশ্রয় নিলেন তিনি। বাংলা ভাষা, অবিনাশী বর্ণমালায় তিনি বলে চলেছেন নিরন্তর-

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।"

মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর কফিন বহন করে নিয়ে চলে এলাম বায়তুল মোকাররম মসজিদে জানাজা শেষে। তাঁর পরিবার-পরিজনের অনেকেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলেন। সব অশ্রুকণা ঢেলে দিলেন তারা। আরও অনেক আপন, সুহৃদ, স্বজন। বাংলার মাটি ও মাতৃক্রোড়ে তিনি শয্যা নিলেন। আমরা আবার প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করলাম।

বাংলার মাটির আলোক উদ্যানে শ্যামবৃক্ষবৃন্তে অনিন্দ্যকান্তি মুকুল যেন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় এম আর আখতার মুকুল।

চির শান্তি, চির কল্যাণ, চির মঙ্গল হোক তাঁর। আর তিনি অর্জন করুন স্বর্গীয় শান্তি, অলৌকিক মুখরতা।

www.nagorikpathagar.org

বই ও বিবেকিতা

"There is only one good, knowledge
And only evil, ignorance."

সক্রেটিস-এর শতাব্দী প্রাচীন সমৃদ্ধ বাণী দিয়েই আমি এ আলোচনা শুরু করতে চাই। কথা বলব বই নিয়েও। ব্যক্তির বিবেকিতা অর্জনের কথা নিয়ে। এই পৃথিবী, প্রকৃতি, জগৎ-সংসারই তো মানুষের প্রধান পাঠশালা। অভিজ্ঞতার উৎস-আকর। এখান থেকেই শুরু হয় মানুষের চেনা-জানা, বুদ্ধি-বিবেচনা, চেতনা-সচেতনা-এই সব জাগর অনুভূতির বিচিত্র প্রবাহ। এই স্পন্দমান চেতনাধারার মধ্য দিয়ে মানুষ-মানুষের সমাজ এগিয়ে যায়, সামনের কোনো দিকে। আর এই দিকচিহ্নটি ক্রমাগত সন্নিহিত করতে থাকে মানুষের গন্তব্যের দিক চিহ্নটি। কতকগুলো অক্ষর, কতকগুলো বর্ণমালা, বাক্যবন্ধ, ভাষালেখ বই আকারে যখন মুদ্রিত হয়-বিচিত্র জ্ঞানরাজির গ্রন্থনায় সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে এক-একটি বই। এক-একটি গ্রন্থ যেন এক-একটি নতুন রাজ্য। নতুন পৃথিবী। এ পৃথিবীর অধিকার সকলেরই আছে যারা জ্ঞান অন্বেষায় শুধু পরিতৃপ্তি পান। আনন্দে উদ্বেলিত হন। ভুলে যান নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার কথা। পরার্থতার সন্ধান করেন। আর যেখানেই পান পরমার্থতার আস্বাদ বা স্বাদ। আমি সক্রেটিসের কথা দিয়ে কেন কথা শুরু করলাম? শত শত বছর আগে সভ্যতা শুরুর পূর্বে তিনি মানব অস্তিত্ব, মানব প্রজ্ঞা এবং জীবনের শুভবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। এই শুভবাদের স্থির অথচ গতিশীল জলপ্রপাত হচ্ছে গ্রন্থ। এই শুভবাদ সৃষ্টি করে একটি মহৎ গ্রন্থ। জাগর চৈতন্য সৃষ্টি করে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আদিকালে মানুষের হাতে কোনো গ্রন্থ ছিল না। বিশাল প্রকৃতিই ছিল তাদের পাঠ-পাঠশালার পাঠক্রম। এ জন্যই মহামতী সক্রেটিস বলেছিলেন- 'একটি মাত্র মহত্তর বিষয় হচ্ছে মানুষের জ্ঞান। আর জ্ঞানহীনতা কিংবা মূর্খতা হচ্ছে একটি 'ইভিল' (উারষ)। ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে সেই মহত্তর জ্ঞানের দরোজা খুলে গেলে হু হু করে বাতাস বয়ে যেতে থাকবে।

এক ইংরেজি কবি বলেছিলেন-"The cup that cheers but not inebriates." অর্থাৎ চা পান করলে নেশা ধরে না কিন্তু ফুর্তি হয়। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, চা

www.nagorikpathagar.org

পান না করলে নেশা না হোক, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তারপর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্রপাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্য চর্চা করার প্রথমটা যে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করার সংকল্প করেছি।' চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করে আমি আমার একটা গ্রন্থে বলেছিলাম-অবিনাশী বাংলা বর্ণমালাই যে মাতৃভাষা। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি আজ একই সমার্থক উচ্চারণ। মায়ের অস্তিত্ব থেকে তো আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারি না। মাতৃভাষা মায়ের অস্তিত্বই ঘোষণা করে। এবং মাতৃভূমি সেই মহান অস্তিত্ব অবস্থানকে স্থায়ী করে রাখে।

তদানীন্তন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। ঐতিহাসিক একুশ দফায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি নামে। ঐতিহাসিক একুশ-দফা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব সন্নিবেশিত ছিল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারটির প্রণেতা ও দিকপাল ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিপুল প্রসার ঘটেছে। নতুন লেখক, নতুন বই, নতুন প্রকাশনা সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। নতুন মেধা ও মননের প্রতিফলন ঘটেছে। এবং এভাবেই দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে আমাদের চৈতন্য ও মননের দিগন্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই বাংলা একাডেমিতে একুশের বইমেলা উৎসব চলেছে। জীবনের দিগন্তকে আরও দূরগামী করতে পারে একটি বই, দু'টি বই, অনেকগুলো বই। বই মানুষের পরম মিত্র। পরম সুহৃদ। প্রতিদিনকার সহযাত্রী। বই কখনও কারো সঙ্গে বৈরিতা করে না। কেবল মিত্রতা দিয়ে যেতে থাকে। মানুষের ভেতরের হিংসা, দ্বেষ, গ্লানি, সীমাবদ্ধতা সংকীর্ণতা সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সবখানে জ্বালিয়ে দেয় অনির্বাণ দীপশিখা। সেখানে আসে হিংসার পরিবর্তে প্রীতি, সখ্য, ভালোবাসা। সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতার ঘেরাটোপ ভেঙে দেয়। সীমাহীনতার, অসীমের ঔদার্য সৃষ্টি করে। আমি তো বইয়ের কোনো বিকল্প দেখি না। যে কোনো সামাজিক আঘাতে ভেতরে ক্ষরণ শুরু হয়ে যেতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। অবক্ষয় শুরু হতে পারে। মূল্যবোধে চির ধরতে পারে। সহসা একটি বই সামনে এসে তার পাতা খুলে দেয়। আবার বিক্ষোভ-আলোড়ন থেকে আত্মারে মুক্তি ঘটায়। এই তো বইয়ের ধর্ম। এই তো বইয়ের বিবেকিতা।

একটি বই হাতে থাকলে কী ঐশ্বর্যই না আমার অর্জন হয়ে যায়! এ যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিত্ত-বৈভব। বই হারালে জ্ঞান হারায়, বই হাতে এলে জ্ঞান ফিরে আসে। মানব-সংবিত নতুন করে জেগে ওঠে। আমি যদি আবারও একটি উদ্ধৃতি তুলে দিই- পাঠক-সহৃদয় ভাববেন, আমি খুবই উদ্ধৃতিপ্রবণ। তাহলে কী হবে! উদ্ধৃতি তো বই থেকেই দিতে হয়। আমি আবারও প্রমথ চৌধুরী থেকে বলব- "এই ডেমোক্র্যাটিক যুগে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক সভ্যতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দূরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন উপরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান দখণ করবে। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্র্যাটিক ও মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণেই গ্রিক সাহিত্য, এত অপূর্ব, অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই; অথচ দুইয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধি বলে তা বিশিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্মীর দল যেমন এক দিকে বাংলায় ডেমোক্র্যাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন, তেমনি আর একদিকে আমাদেরও পক্ষে মনের কাব্যকলার চর্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে কাব্যকলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক, এই হচ্ছে দেশের কাছে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।"

জীবনকে জানতে, জীবনকে চিনতে চিনতে জীবনকে দেখতে এবং দিগন্তের দিকে মেলে দিতে গ্রন্থের জগতে আমাদের ঠাঁই নিতেই হবে। সুতরাং বইমেলা তো জীবনেরই মেলা। সেই মেলাতে দল বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে সম্পূর্ণ মনোবিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা

ভারত ডোমেনিয়ন স্বাধীন, সার্বভৌম দু'টি রাষ্ট্র সীমানায় বিভক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। ব্রিটিশ বেনিয়াদের আধিপত্যবাদী ও ঔপনিবেশিক নাগপাশ ছিন্ন করে উপমহাদেশীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিক 'অবয়ব' ও 'অবকাঠামো'তে যোজিত হয়েছিল নতুন দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিকমাত্রা।

আমরা তখন যে নতুন রাষ্ট্র সীমানার মালিক হয়েছিলাম সেখানে সর্বপ্রথম অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দিলো রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের সমস্যাটি। সমাজ সমস্যা, ভাষা সমস্যা, রাষ্ট্র সমস্যা এ সবই একযোগে দেখা দিয়েছিল তখন। মার্কস রাষ্ট্রকে উপরিকাঠামোর উপাদান হিসেবে গণ্য করেও অন্যভাবে বলেছেন, "State is the structure of Society." অর্থাৎ রাষ্ট্রও সমাজের কাঠামো নির্মাণ করতে পারে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'ক্ষমতাকে' বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে। এ জন্য মানবসমাজে 'রাষ্ট্র' ও শ্রেণির উৎপত্তি, উৎস-আকর আর এসব কিছুর বিবর্তন ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সন্নিহিতির উন্মোচন একান্ত জরুরি বিষয়। তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ কাঠামোর প্রথম থেকেই যে স্ব-আরোপিত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল 'রাষ্ট্রভাষা' প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নে- তার সর্বপ্রথম প্রধান আঘাত ও আক্রমণটি এসে পড়ে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষের ভাষা বাঙালির বাংলা ভাষার ওপরই। আর এ আঘাতটি ছিল অযৌক্তিক, অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং সর্বোপরি বর্বরোচিত।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির আবাস্থলকে বলা হতো, 'বঙ্গদেশ'। ইংরেজিতে বলা হতো 'বেঙ্গল'। আর এটা এসেছে পর্তুগিজদের দেয়া 'বেঙ্গল' শব্দ থেকে এবং 'বেঙ্গলা' তারপর 'বঙ্গলাহ' থেকে বঙ্গাল শব্দের রূপান্তর ঘটেছে। চর্যাপদে ভুসুকু পাদের একটি চর্যায় আছে: ভুসুক তুই আজি বাঙালি ভইলি।'

অর্থাৎ ভুসুক তুমি আজ বাঙালি হলে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাগ মুসলিম আমলে 'বঙ্গাল' বলতে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে বুঝাতো। 'বঙ্গ' শব্দের ঠিক সমর্থকও ছিল না এটা। 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' শব্দ দুটির যুগপৎ ব্যবহার লক্ষ করে থাকব। 'বঙ্গ' শব্দ বাংলার এক বিপুল অংশকে চিহ্নিত করে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদের ধারণা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ প্রাগার্য তিব্বতীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত। কেউ কেউ আবার 'বঙ্গ' শব্দটিকে 'মুণ্ডারি' ভাষার শব্দ বলে চিহ্নিত করেন। প্রথমে 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল এক কৌম গোষ্ঠীর নাম। আমরা প্রথমে 'বঙ্গের নাম পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসী' বা পক্ষী জাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে। এই 'বয়াংসী' শব্দটি আর্যেরা তুচ্ছার্তে ব্যবহার করত। কারণ এটা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সত্য যে, ওরা বারবার বাঙালির দ্রোহে এবং প্রতিরোধে প্রতিহত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা 'বয়াংসী' সম্ভবত তাদের ' টোটেম'।

পরবর্তীকালে- গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান ইত্যাদি নামে বাংলার জনপদগুলো চিহ্নিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিই এর প্রমাণ। তবে সমগ্র বাংলাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল- এর সপক্ষে সুনিশ্চিত সাক্ষ্য অবশ্য নেই।"

এগারো শতকের লিপিতে আমরা প্রথম 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাই। আর বঙ্গাল শব্দই মুঘল আমলে বঙ্গদেশকে বঙ্গাল নামে অভিহিত করে। মুঘল সাম্রাজ্যের এটা ছিল পূর্বকার সুবা এবং এর বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথির পূর্বপ্রান্ত থেকে চট্টলা এবং অধুনা চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুঘল আমলেই বাংলাদেশ একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়। আমি এখানে এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির একটি বিবরণ উপস্থাপন করছি।

> "রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে মুঘল সম্রাট আকবরের ভূমিমন্ত্রী টোডরমল্ল ১৫৮২ সালে বাংলাদেশকে ১৯ দুটি সরকারে বিভক্ত করেন। ৬৮৯টি মহল ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। দিল্লির মুঘল দরবারে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,০৬,৯৩,০৬৭ আকবারশাহী টাকা।
>
> আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলাদেশ ৩৪টি সরকারে বিভক্ত হয়; এর

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৩৫০টি মহাল ও রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। বাংলাদেশে সামাজিক ইতিহাসে গৌড় নামটি বেশ প্রাচীন। পণ্ডিতদের ধারণা এক সময় বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হতো ও তা থেকে গুড় উৎপন্ন হতো এবং এই গুড় থেকেই গৌড় নামের উৎপত্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা গৌড়দেশের পণ্যের উল্লেখ পাই।"

যে-কোনো জনগোষ্ঠীর মানবতাত্ত্বিক পরিচয় জানা খুব জরুরি। কোনো দেশে সমাজগঠনের সেটা সব থেকে বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের বাঙালি বলা হয়। রাষ্ট্রীয়তার বাস্তবতায় আমরা বাংলাদেশি। সমাজবিজ্ঞানীরা বারবার উল্লেখ করেছেন, বাংলার আদি অধিবাসীরা বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। তারা ছিল প্রাগ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। তারা যে ভাষায় কথা বলত তাকে অস্ট্রিক ভাষা বলা হয়। বাংলাদেশে অষ্টিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরা অস্টিক ভাষাভাষীদের অনুগমন করে। এই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ ঘটে। দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের পরে আসে আর্য-ভাষাভাষী একদল লোক। উউরোপের 'আলপাইন' নরগোষ্ঠীভুক্ত। মানববিজ্ঞানের ভাষায় প্রাগ-দ্রাবিড়দের 'আদি-অস্ত্রাল' বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদি-অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল দেখা যায়।

১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি বাংলা বিজয় করেন। তখন থেকে বাংলায় মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। আরব দেশীয় বণিকরা বাংলার সাথে বাণিজ্য করতে এসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এখানে তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতো বাংলার অধিকাংশ মুসলিম তিন সূত্র থেকে আগত। ধর্মান্তরিত উচ্চ শ্রেণি, ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণি এবং খুবই মিতপরিমাণ অন্য স্থান থেকে আগত মুসলিম। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন: "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতির নিজের হাতে আমাদের চেহারায়, ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিটিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাড়িতে ঢাকবার জো-টি-নেই।"

www.nagorikpathagar.org

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যেসব মুসলিম বাঙালি লেখক এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, শেখ মুতালিব এবং আবদুল হাকিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তারাই 'বঙ্গবাণী'কে বাঙালি মুসলিমদের মাতৃভাষা দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে অসীম রায়ের বক্তব্য স্মর্তব্য :

"...the contemptuous attitude of the Hindu elite to the local language found a striking paralled in Asraf's attempt for the same. To the Hindu Elitel, Sanskrit was the divine language (deva-bhasha) while the local language was variously called, deshi-bhasha, laukik, or lok bhasha and parakrit or prakrit bhasha."

বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশধারার পথটিকে রুদ্ধ করার জন্যে ১৯৪৭-এর পর থেকেই এদেশে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজকণা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা, স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থান, ঐতিহাসিক এবং মানবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটিকে সংরক্ষণ করার জন্য বিপুল সচেতনার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে থাকি। নব উদীয়মান জাতি হিসেবে আমরা অর্জন করতে থাকি গণচেতনা, গণবোধ এবং আধুনিক সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল অব্দি বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ সারস্বত সুশীলসমাজ এবং বিপুল জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বাত্মক সংরক্ষণ ও বিকাশের অগ্নি-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হতে থাকে এবং বাংলাদেশের সমাজ ও সমাজচিন্তা এই মূলধারার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আবর্তিত-বিবর্তিত হতে থাকে এবং চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রক্তাক্ত বিপ্লবের রূপ ধারণ করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষা মানব সমাজের কাঠামো নির্মাণের প্রথম ও প্রধান শক্তি। একে নিয়ামক শক্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। মানুষের ভাষাই মানুষর সমাজের মূলভিত্তিটি নির্মাণ করে। আসলে ভাষা উপরিকাঠামো। মানুষ তার নিজের সমাজে নিজের ভাষাকে ব্যবহার করে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে। এভাবে আদান-প্রদানের পরিসরকে পরিপুষ্ট করে। মনোবিজ্ঞানী মরগ্যান মানুষের লিখিত ভাষা ও বর্ণমালার আবিষ্কারকে মানবসভ্যতার সূচনাবিন্দু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা পাকিস্তানি পাঞ্জাবের শাসকচক্রের রোষানলে পড়ে। দুষ্ট রোষচক্রের ঔপনিবেশিক ও অসভ্য আচরণ লক্ষ করে এবং মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। সমগ্র জাতির অখণ্ড, প্রচণ্ড সশস্ত্রতার একুশের ধারাবাহিকতা ধরে স্বাধীনতার যুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মদান ১৯৭১-এর স্বাধীনতার রক্তবাজ কুঁড়িকেই অঙ্কুরিত করেছিল।

রাষ্ট্রভাষা মানে রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালিত, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত ভাষা। রাষ্ট্রভাষার আদর্শ নীতি-পদ্ধতি পরিকল্পনা থাকবে। রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি অফিস-আদালতের কাজ চলবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সকল শিক্ষার বাহন হবে। রাষ্ট্রভাষার সাহায্যে শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন হবে। এ জন্য এটা প্রতীয়মান হয় যে, যে কোনো রাষ্ট্রের মাতৃভাষার দাবিই সেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা হওয়াটাই সর্বতোভাবে বাস্তবসম্মত ব্যাপার। যদিও অন্য ভাষায় অফিস-আদালতের কাজ চলতে পারে। যেমন মোগল আমলে এটা সম্পন্ন হয়েছে ফার্সি ভাষায়। ব্রিটিশ আমলে হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। এ আমলে বাংলা ভাষায় হওয়াটাই ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই স্বাভাবিকভাবে ক্রমাগত অগ্রসর ও উন্নতি লাভ করতে পারে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা না জন্মালে মায়ের প্রতিও ভালোবাসা প্রগাঢ় ও নিবিড় হতে অনেক প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি হয়। নিজের ভাষার বিশ্বাস ও ভালোবাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে আপন আত্মার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং ক্রমাগত আত্মার প্রসার ঘটে। আপন ভাষাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করে আত্মার উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম খেদ, শ্লেষ ও বিদ্রোহ উসকে দিয়ে বলেছেন :

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

www.nagorikpathagar.org

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।"

বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রগতি ও সভ্যতার বাহক হয়ে উঠেছে এ কথা আজ বিশ্বজনীন, সর্বস্বীকৃত। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হিসেবে বাংলাভাষাকে আমরা অধুনা ব্যবহার করছি। এ ভাষার ঐতিহ্য হাজার বছরের প্রাচীন। ঐশ্বর্য, বৈভব, বিভব অতুলনীয়। আন্তর্জাতিক মাত্রাস্পর্শী। ভারতীয় বহু ভাষায় অভিজ্ঞ-পণ্ডিত ড. উইলিয়াম কেরি বাংলা গদ্যের আদি যুগে যে মন্তব্য করেছিলেন এখানে সেটা স্মরণযোগ্য :

"Convinced I am that Bengali intrinsically superior to all another Indian Languages."

অর্থাৎ বাংলা ভাষা ভারতীয় অন্যান্য সব প্রচলিত ভাষার চেয়ে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, এটা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিনটি যোজনা করেছে অগ্নিফলকের অধ্যায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ পৃথিবীবাসীর চেতনার অক্ষরেখা স্পর্শ করেছে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে এই স্বীকৃতি প্রদান বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতির অনন্যপূর্ব বিজয়। এই বিজয় বাঙালি জাতির, বাঙালি সংস্কৃতির এবং বাংলা ভাষা ও সভ্যতার। এ বিজয়ের কোনো প্রতিতুলনা নেই।

বাংলা ভাষা আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং পৃথিবীবাসী বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার কারণেই এখন সারা পৃথিবীতে বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদার আসন অর্জন করেছে। অধুনা এই অর্জন ও প্রাপ্তিকে আগামী পৃথিবীর জন্য আরও গৌরবপূর্ণ করে তুলতে হবে। বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্য, অবস্থান, বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশমান পর্ব ও স্তরগুলো পদ্ধতিগতভাবে আন্তর্জাতিক ভাষাগোষ্ঠী মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তবেই আমাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থানে ও মাতৃভাষার শুদ্ধ পাঠ, সুষম বিকাশ, সামাজিকভাবে ব্যাপক চর্চা, জেলা পর্যায়ে বাংলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্রের সকল

www.nagorikpathagar.org

কাজ বাংলায় করার প্রায়োগিক (Pragmatic) ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত ত্বরান্বিত করার সকল মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেবল রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করলেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করা হয়ে যায় না। পৃথিবীর চলমান ভাষাসমূহের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক ভাষা শিক্ষার (Comparative study) সাথে বাংলাকে অঙ্গীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নির্বাচনী প্রতীক নৌকা মার্কায় বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেন ঐতিহাসিক একুশ দফার সমর্থনে। একুশ দফার একটি দাবিতে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহান প্রজাতন্ত্রের পক্ষে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে 'আন্তর্জাতিক ভাষা উৎসব' আয়োজন করার জন্যে আমি প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

শুভ তু একুশে ফেব্রুয়ারি।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম